কর-নীতি

ও

ভারতের রাজস্ব-নীতি

প্রথম সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মূল্য পাঁচ সিকা

১২২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—
আর্থিক জগৎ প্রেসে
শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব—

৺হরিশ্চন্দ্র সেন

ও

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী—

৺গোলোকেশ্বরী দেবী-র

পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশে

ভূমিকা

SENATE HOUSE
CALCUTTA.

আজ কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গ-ভাষায় অর্থ-নীতি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার প্রধান প্রতিবন্ধক সহজবোধ্য পুস্তকের অভাব। আমরা এতকাল ইংরাজীতে অর্থ-নীতির আলোচনা করায় বিষয়টীর প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সহিত অর্থ-নীতি বিষয়ক পুস্তকও সরল ভাষায় প্রকাশ করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কেবল বঙ্গ-ভাষার সমৃদ্ধি সাধনই করিবে না, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিরও সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কর-নীতি অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান শাখা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপর ইহার কিরূপ প্রভাব তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে সহজ পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অভাব। শ্রীযুত অনাথ গোপাল সেন তাঁহার "কর-নীতি" পুস্তকে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি ভারতের রাজস্ব-নীতি সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকটী সময়োপযোগী হইয়াছে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

সিনেট হাউস,
২৪শে জুন, ১৯৪০

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

আর্থিক সমস্যার তাড়নায় কিংবা সময়ের গুণে বাঙ্গালী পাঠক আজ আর অর্থ-নীতি বিষয়ক আলোচনায় উদাসীন নহেন; মাতৃ-ভাষাও আজ আর তাঁহাদের নিকট অবজ্ঞার বস্তু নয়—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শুভ-বুদ্ধি ও গণ-জাগরণের কল্যাণে তাহা হইবারও আর উপায় নাই। তাই দেশবাসীর এই নব-জাগ্রত ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবার গুরুভার দেশের পণ্ডিতদের উপর নূতন দাবী উপস্থিত করিয়াছে। এই দাবী পূরণ করিতে না পারিলে তাঁহাদের পক্ষে ইহা যেমন কলঙ্ককর, দেশবাসীর পক্ষেও তেমনি ক্ষতিকর হইবে। তাই যোগ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিবার জন্যই আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকেও এ পথে নামিতে হইয়াছে। মৎপ্রণীত "টাকার কথা"র অভাবনীয় সমাদর হইতে বুঝিতে পারিতেছি, ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে; পণ্ডিতগণ আবাদের ভার গ্রহণ করিলে, ভাল ফসলের অভাব হইবে না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আমরা অর্জন করিয়াছি। নূতন আগত-প্রায় বিশ্ব-ব্যবস্থায় শীঘ্রই পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিবার আশা আমরা পোষণ করিতেছি। এমতাবস্থায় কর-নীতির মূল সূত্রগুলি আমাদের প্রত্যেকেরই ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। কারণ [illegible] উন্নতি সাধন করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের কর-নীতির [illegible] ব্যয়ের সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্র[illegible]

বিষয়ে বাংলা ভাষায় কোন বই নাই বলিয়াই জানি। তাই আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমি মাতৃ-ভাষায় এই বিরাট ও জটিল বিষয়ের প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছি। লেখাগুলি পূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকদের হৃদয়ে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-স্পৃহার উদ্রেক করাই আমার উদ্দেশ্য—ক্ষুধার পূর্ণ নিবৃত্তি আমার উদ্দেশ্যও নহে, সাধ্যও নহে। আমার এই উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিলে এবং মাতৃ-ভাষার সাহায্যে এবম্বিধ আলোচনায় পণ্ডিত-মণ্ডলীকে অধিকতর অগ্রসর হইতে দেখিলেই আমি আমার প্রয়াস সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে, এই পুস্তক প্রণয়ণে আমাকে ডক্টর এইচ, ডেলটন প্রণীত "পাব্লিক ফিনান্স" ও ডক্টর জেড্ এ আহ্ম্মেদ প্রণীত "পাব্লিক রেভিনিউ এণ্ড এক্স্পেন্ডিচার ইন্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকদ্বয়ের সাহায্য বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে—তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে নূতন করিয়া ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

৩০২, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।
১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৭

বিনীত
শ্রীঅনাথ গোপাল সেন

সূচিপত্র

কর-নির্ধারণ রীতি

কর-নীতি (২য় খণ্ড)

করনীতির কয়েকটী সূত্র

করের প্রয়োজনীয়তা

ট্যাক্স বা কর মানুষের জীবনে একটা উপদ্রব বিশেষ। ইহা নানা আকারের ও নানা প্রকারের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য; সমাজে বাস করিয়া ধনী বা নির্ধন কাহারও ইহার হাত হইতে একেবারে মুক্তি নাই। আমাদের বহুক্লেশ-অর্জিত আয়ের উপর ভাগ বসাইবার এই দাবীকে মানুষ স্বেচ্ছায় কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা মানিয়া না-লইলেও প্রবল রাষ্ট্রশক্তির ও সমাজানুগত্যের প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং সমাজে বা রাষ্ট্রে ট্যাক্স বা করের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে এক্ষণে তর্কের স্থান নাই। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিক হইতে মানুষের নিকট ইহা যতই বিরক্তিকর হউক না কেন, সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রকে সমাজের বা প্রজাসাধারণের প্রতি তাহার নির্ধারিত কর্তব্য পালন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন এবং যে পর্যন্ত রাষ্ট্রের জন্য নিজস্ব সম্পত্তি সৃষ্টি করিয়া যথেষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করা না হইতেছে (ইহা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই অধিকতর সম্ভবপর) সেই পর্যন্ত এই অর্থসংগ্রহের জন্য সর্বসাধারণের উপর কর-নির্ধারণ অনিবার্য। রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য অর্থের আবশ্যকতাকে যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে, কোন্ নীতি অনুসারে কর নির্ধারণ করা হইবে এবং তাহার ন্যায্যতা-অন্যায্যতা পরীক্ষা করা যাইবে কোন্ সূত্র দ্বারা ?

করের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—যে-অর্থ কর্তৃপক্ষ কর বাবদ আদায় করিয়া থাকেন তাহার ব্যয় প্রজাসাধারণের পক্ষে কতটা কল্যাণপ্রদ হইয়াছে; অর্থাৎ যদি এই অর্থ প্রজাসাধারণ নিজেরা ব্যয় করিতে পারিত তাহা হইলে সমাজের অধিকতর মঙ্গল হইতে পারিত

কি না। প্রত্যক্ষভাবে দেশের ধন-সম্পদ-বৃদ্ধিই সামাজিক কল্যাণের একমাত্র মাপকাঠি নহে। কারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য রাষ্ট্র যে-অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা মুখ্যতঃ সমাজের ধনবৃদ্ধি না-করিলেও ইহা পরিণামে অধিকতর সামাজিক মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। কোন্ উপায়ে সংগ্রহ এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইতেছে, এই দুয়ের বিচারের উপরই করের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা নির্ভর করিবে। তবে এই অভিযোগ আজ রাষ্ট্রপতিদিগকে নতশিরে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, রাষ্ট্রের অপব্যয় ও অমিতব্যয় মানুষের নিকট করভারকে অধিকতর দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে অমিতব্যয়িতা অপেক্ষা অবিমৃষ্যকারিতাই অধিকতর বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যেহেতু সুবিবেচনা সহকারে অর্থব্যয় করিতে পারিলে অমিতব্যয়িতাও ততটা দোষণীয় হয় না।

সরকারী অর্থের সদ্ব্যয়

রাষ্ট্রীয় অর্থের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে আমরা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত নিদর্শন দ্বারা তাহার বিচার করিতে পারি।

(১) বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা হইতে সমাজকে রক্ষা করা। ইহা রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্যপালন শুধু ব্যয়বহুল পুলিশ ও সামরিক আয়োজন দ্বারাই সুসম্পন্ন হয় না; এইজন্য দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বহুদর্শিতা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ও তদনুযায়ী কার্য করিবার উপযোগী কর্মকুশলতা থাকাও প্রয়োজন।

(২) দেশের উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষসাধন।

(৩) উৎপন্ন পণ্য বণ্টনের সুব্যবস্থা; বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থামধ্যে আর্থিক বৈষম্য যথাসম্ভব সমীকরণ; প্রজাসাধারণের বিশেষতঃ দরিদ্রশ্রেণীর আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি দূর করিয়া তাহার সমতা সাধন।

কেবলমাত্র বর্তমানের ব্যবস্থা করিলেই রাষ্ট্রপতিগণের চলিবে না; দূরদৃষ্টি লইয়া দেশের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তাহাদিগকে করিতে হইবে। কারণ ব্যক্তিবিশেষের জীবন অচিরস্থায়ী হইলেও সমাজ-জীবনকে দীর্ঘ ও যতটা সম্ভব চিরস্থায়ী করিবার ভার রাষ্ট্রপতিগণের উপর।

ব্যয়কুচ্ছ্রতাই রাষ্ট্রের একমাত্র আদর্শ নহে

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ব্যয়কুচ্ছ্রতাই রাষ্ট্রের পক্ষে চূড়ান্ত আদর্শ নহে। অধিকতর অর্থব্যয় করিয়া যদি অপেক্ষাকৃত অধিক সুফল পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে আপত্তি করা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং আমরা যখন বলি সাধ্যের অতিরিক্ত কর ধার্য করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য নহে, তখন আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত এই নীতিকেও আমরা বিচার না করিয়া মানিয়া লইতে পারি না। সর্বসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী অধিকতর অর্থব্যয় করিতে সুযোগ দিবার জন্যই সুধু সরকারী ব্যয় হ্রাস করা সমীচীন বিবেচিত হইতে পারে না। এইরূপ নীতি প্রচলিত ধারণার বিপরীত বোধ হইলেও রাষ্ট্রীয় জীব হিসাবে মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের দিক হইতে ইহা মোটেই অসঙ্গত নহে,—যদি রাষ্ট্র এই অর্থদ্বারা প্রজাসাধারণের প্রতি তাহার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে পারেন। বৈদেশিক শাসনের অধীনে নানারূপ দুর্ভোগ ও দুর্যোগের মধ্যে সমাজ-জীবন যাপন করিয়া আমাদের পক্ষে কর সম্বন্ধে বিরূপ ভাব পোষণ করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ সমাজ ও আদর্শ কর-নির্ধারণ নীতিকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে এই আলোচনা করিতে হইবে। কোন রাষ্ট্রবিশেষের অনাচার বা অবিচার এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ব্যয় সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় অধিকারের সীমা নির্দেশ করা যাইবে কি প্রকারে? রাষ্ট্রের সম্মুখে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকিলে

তাহার নিষ্ফল ব্যয়-প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা সহজ হইবে না। সেই হেতু রাষ্ট্রপতিগণের পরিচালনার জন্য একটি সহজ ও সুসঙ্গত সূত্র নির্ধারিত হইয়াছে। ব্যয়ের অনুপাতে সমাজের কল্যাণের অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত অধিক হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যয়বাহুল্য অনুমোদন করা যাইতে পারে; কিন্তু যখনই দেখা যাইবে যে অধিক ব্যয়ে আর অধিকতর সুফল লাভের আশা করা যায় না, তখনই রাষ্ট্রকে অর্থব্যয় হইতে বিরত হইতে হইবে। অধিকতর ব্যয় দ্বারা যে সুফল পাওয়া যাইবে তাহার জন্য যদি উহার সমপরিমাণ করবৃদ্ধিরও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যয়বাহুল্য সমর্থনযোগ্য নহে। অবশ্য এই লাভালাভের সীমানির্দেশ একেবারেই সহজসাধ্য নহে; কারণ ইহার জন্য একদিকে দেশের আর্থিক অবস্থা ও অন্যদিকে দেশের সমষ্টিগত কল্যাণসাধনের উপায়, এই উভয় সম্পর্কে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত আবশ্যক তাহা রাষ্ট্রের পক্ষেও সুলভ নহে। তদুপরি কর্তৃত্বাভিমানী মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা রহিয়াছে। সর্বসাধারণের দেয় সহজলভ্য ধনের অধিকারী হইয়া তাহার ব্যয় সম্পর্কে শক্তিমান শাসকশ্রেণীর পক্ষে সংযম ও সুনীতি রক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। আমাদের দেশে স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের অভাবে এইরূপ আচরণ আমরা অহরহ চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

সরকারী ব্যয়ের সীমা নির্দেশ

মানুষের অর্থব্যয়ের সহিত রাষ্ট্রের অর্থব্যয়ের মূলগত পার্থক্য কোথায় এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম কথা, ব্যক্তিবিশেষ তাহার আয়-অনুযায়ী ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়া থাকে; কিন্তু রাষ্ট্র ব্যয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে। অবশ্য দুর্দিনে রাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় না এবং তাহাকেও ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষ নিজের ও তাহার

ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত ব্যয়ে প্রভেদ

সন্তানসন্ততির স্বার্থের বাহিরে সাধারণতঃ দৃষ্টিপাত করিতে পারে না; তাহাদের কল্যাণ সাধনের জন্যই তাহার অধিকাংশ অর্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে ; তাহার প্রয়োজন, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রের এরূপ অদূরদর্শী হইলে চলে না, তাহার দৃষ্টি হইবে সুদূর প্রসারী। অর্থব্যয় সম্পর্কে এইখানেই উভয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য। তারপর রাষ্ট্র যত সহজে তার আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি করিতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে ; এবং ইহার কারণও সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রের পক্ষে তাহার অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বিরাট প্রজা-সম্প্রদায় পড়িয়া রহিয়াছে। সর্বশক্তিমান হিট্‌লার ও মুসোলিনির দেশে ত ইহা সহজসাধ্য হইতেই পারে, গণতান্ত্রিক দেশেও করভার বৃদ্ধি করিবার পক্ষে শাসকবর্গের অজুহাতের অভাব হয় না।

অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষ অর্থের অধিকতর সদ্ব্যবহার করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। একথা যেমন সত্য নহে ইহার বিপরীত ধারণাও তেমনই অভ্রান্ত নহে। মোটের উপর একথা বলাই অধিকতর সঙ্গত হইবে যে, সর্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় না করিয়া তাহাদিগকে ঐ অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় করিবার অধিকার দেওয়া হইলে তাহারা ইহার যেরূপ ব্যবহার করিত তদপেক্ষা রাষ্ট্র ঐ অর্থের যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা সমাজের অধিকতর সমষ্টিগত কল্যাণ সাধারণতঃ সাধিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহাই হওয়া উচিত।

সরকারী ব্যয়ের নীতি সম্পর্কে আমরা উপরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে সরকারী আয়ের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। প্রথমতঃ সরকারী আয়ের কয়েকটি সাধারণ পন্থা আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

সরকারী আয়ের পথ ও প্রকৃতি

(১) কর বা ট্যাক্স।

(২) সমর কিংবা সন্ধিজাত সেলামি (Tributes) ও ক্ষতিপূরণ (Indemnities)।

(৩) আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড। এই সব অর্থের আদায় বাধ্যতামূলক এবং ইহার বিনিময়ে প্রত্যক্ষ প্রতিদান কিছু পাওয়া যায় না।

(৪) সরকারী সম্পত্তি বা খাসমহালের আয়।

(৫) সরকারী ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে আয়।

(৬) সরকারী ঋণ গ্রহণ।

(৭) কাগজী নোট প্রচলন।

(৮) কাহারও স্বেচ্ছাকৃত দান।

(৯) এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি বিবিধ আয়।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার সরকারী আয়ের নমুনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কতকগুলি বিষয়ে প্রজাসাধারণ রাষ্ট্রকে যে অর্থ দেয় তদ্বিনিময়ে তাহারা একটা প্রতিদান পাইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চতুর্থ ও পঞ্চম দফার আয় দ্রষ্টব্য। খাসমহালের জমি বন্দোবস্ত লইয়া, ডাকঘর, রেলওয়ে, ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করিয়া, সরকারী কারখানায় প্রস্তুত পণ্য ক্রয় করিয়া আমরা যে অর্থ রাষ্ট্রকে দিই তাহার বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে একটা কিছু আমরা পাইয়া থাকি। অধিকন্তু করের ন্যায় ইহার মধ্যে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই ; কারণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করা না-করা আমাদের অনেকটা ইচ্ছাধীন।

করের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

এখানে করের একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। যাহার বিনিময়ে করদাতা মুখ্যতঃ কোন প্রতিদান পায় না, রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত এইরূপ বাধ্যতামূলক দানকে আমরা 'কর' বলিতে পারি। এই করকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ—যথা, প্রকাশ্য বা প্রত্যক্ষ কর ও অপ্রকাশ্য বা পরোক্ষ কর। আয়কর (Income tax), উত্তরাধিকার-কর (Inheritance tax) ও সম্পত্তির

উপর নির্ধারিত করকে প্রত্যক্ষ কর এবং পণ্যসম্ভার ও ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিরূপিত করকে পরোক্ষ কর বা শুল্ক গণ্য করা হয়। প্রত্যক্ষ কর যাহার উপর ধার্য করা হয় তাহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে উহা দিতে হয়; পক্ষান্তরে পরোক্ষ কর এক জনের উপর ধার্য হইলেও তিনি উহা অপর ব্যক্তির উপর পরিচালনা করিয়া দিতে পারেন। কারণ পণ্যের উপর কর নির্ধারিত হইলে পণ্যোৎপাদনকারী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া ক্রেতার উপর এই কর পরোক্ষভাবে আরোপিত করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ কর ধনীরা এবং পরোক্ষ কর দরিদ্রেরা সাধারণতঃ দিয়া থাকে। কিন্তু আয়-অনুযায়ী প্রত্যক্ষ কর নির্ধারণ না-করিয়া যদি সকলের উপর আয়-নির্বিশেষে একই পরিমাণ কর ধার্য করা হয়, তাহা হইলে দরিদ্রের নিকট হইতেই বেশীর ভাগ প্রত্যক্ষ কর আদায় হইবে। ঠিক সেইরূপ কেবলমাত্র বিলাস-সামগ্রীর উপর যদি পরোক্ষ কর ধার্য করা যায়, তাহা হইলে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীকেই বেশীর ভাগ উহা দিতে হইবে।

আয়কর, সম্পত্তিকর, পণ্যশুল্ক ও ষ্ট্যাম্প ডিউটি

এখানে আয়কর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই কর মানুষের মূলধন বা নগদ তহবিলের উপর ধার্য করা হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া আমরা যে টাকাটা নিট লাভ করিয়া থাকি, অথবা বিনা মূলধনে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও শ্রম দ্বারা যে-অর্থ উপার্জন করি, তাহারই উপর এই কর নির্ধারিত হয়। কাহারও ব্যবসায়ে এক লক্ষ টাকা খাটিলে এবং টাকা প্রতি ৬ পাই হারে আয়কর দিতে হইবে বলিলে, এক লক্ষ টাকার উপর ইহা দিবার দায়িত্ব বুঝাইবে না—পরন্তু এই লক্ষ টাকার ব্যবসা হইতে বৎসর শেষে যাহা নিট লাভ হইবে, ৫,০০০৲ কিংবা ১০,০০০৲ টাকা, তাহার উপরই ঐ হারে কর দিতে হইবে। সম্পত্তির উপর কর ও পণ্যদ্রব্যের উপর কর, এই উভয়ের

পার্থক্যও হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। যাহা স্থায়ী তাহাকেই সম্পত্তিরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। যথা, জমিজমা ভূসম্পত্তি। যাহা নিত্যব্যবহার্য, নিঃশেষযোগ্য কিংবা ক্ষয়শীল তাহাই পণ্যসম্ভার ; যথা, আহার্য বস্তু, পরিধেয় বসন-ভূষণ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি। গৃহাদি, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিকে এই উভয়ের কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না—ইহারা উভয়ের মধ্যবর্তী। সম্পত্তি-কর ও পণ্য-শুল্কের প্রভেদ বুঝিবার একটি সহজ পরীক্ষা এই যে, সম্পত্তিকর সাধারণতঃ একবার দিতে হয় ; পক্ষান্তরে পণ্যশুল্ক নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী দিয়া যাইতে হয়। ইহা আবার দুই প্রকারে আদায় হইয়া থাকে : (ক) পণ্যের ওজন বা পরিমাণ অনুযায়ী ; (tax per unit) যথা, প্রতি মণ লবণ কিংবা প্রতি গ্যালন মদের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে শুল্ক দেয়। অথবা (খ) পণ্য-মূল্যের একটা নির্দিষ্ট অংশানুযায়ী ; (tax ad valorem) যথা, প্রত্যেক বন্দুকের কিংবা বাদ্যযন্ত্রের যাহা মূল্য তাহার এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ শুল্ক হিসাবে দেয়। দলিল-দস্তাবেজের উপর আমরা "ষ্ট্যাম্প ডিউটি" নামে যে শুল্ক দিয়া থাকি তাহাকে কোন বিশেষ কর রূপে গণ্য করা যাইতে পারে না ; ইহা সম্পত্তি—বা পণ্য-কর আদায়ের একটি উপায় মাত্র। আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাহা অসংখ্য প্রকারের, কারণ মানুষের উপার্জনের পথও অসংখ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি, কলাকৌশল প্রভৃতি দ্বারা মানুষের আইন-সঙ্গত সর্বপ্রকার উপার্জনের উপরই এই কর নির্ধারিত হইয়া থাকে।

ভারতে আয়করের নিরিখ

সাধারণতঃ কোন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কাহারও বার্ষিক আয় কম হইলে তাহাদের আয়কর দিতে হয় না। আমাদের দেশে কর-নির্ধারণ-যোগ্য সর্বনিম্ন বার্ষিক আয় ২,০০০৲ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। মাঝে বার্ষিক ১,০০০৲ টাকার উর্ধে সমস্ত আয়, কর ধার্যের যোগ্য এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল।

আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী আয়করের নিরিখ বা হারও কম বেশী হইয়া থাকে। ১৯৩৯ সালের ইণ্ডিয়ান ফিনান্স অ্যাক্ট পাশ হইবার পূর্বে আয়-করের নিরিখ নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

২,০০০৲ টাকা হইতে ৫,০০০৲ টাকার নিম্নে টাকা প্রতি ৬ পাই,
৫,০০০৲ টাকা হইতে ১০,০০০৲ টাকার নিম্নে টাকা প্রতি ৯ পাই,
১০,০০০৲ টাকা হইতে ১৫,০০০৲ টাকার নিম্নে টাকা প্রতি ১২ পাই,
১৫,০০০৲ টাকা হইতে ২০,০০০৲ টাকার নিম্নে টাকা প্রতি ১৬ পাই,
২০,০০০৲ টাকা হইতে ৩০,০০০৲ টাকার নিম্নে টাকা প্রতি ১৯ পাই,
৩০,০০০৲ টাকা হইতে ৪০,০০০৲ টাকার নিম্নে টাকা প্রতি ২৩ পাই,
৪০,০০০৲ টাকা হইতে ১,০০,০০০৲ টাকার নিম্নে টাকা প্রতি ২৫ পাই,
১,০০,০০০৲ টাকা হইতে উর্ধে টাকা প্রতি ২৬ পাই আয় কর দিতে হয়। ইহার উপর "সার-চার্জ" ও "সুপার ট্যাক্স" আছে।

১৯৩৯ সাল হইতে নিম্নলিখিত হার নির্ধারিত হইয়াছে :—

১। মোট বার্ষিক আয়ের প্রথম ১,৫০০৲ টাকার উপর কোনরূপ আয়-কর লাগিবে না,

২। পরবর্তী (অর্থাৎ ১,৫০০৲ টাকা বাদে) ৩,৫০০৲ টাকার উপর টাকা প্রতি ৯ পাই,

৩। তৎপরবর্তী ৫,০০০৲ টাকার উপর টাকা প্রতি এক আনা তিন পাই,

৪। তৎপরবর্তী ৫,০০০৲ টাকার উপর টাকা প্রতি দুই আনা,

৫। তদূর্ধে অবশিষ্ট টাকার উপর টাকা প্রতি দুই আনা ছয় পাই।

এই নূতন আইন অনুসারেও যাহার বার্ষিক আয় ২,০০০৲ টাকার অধিক নহে, তাহাকে আয়-কর দিতে হইবে না এবং কাহারো আয়কর তাহার মোট আয় হইতে ২,০০০৲ টাকা বাদ দিয়া যে আয় থাকে তাহার অর্ধেকের বেশী হইতে পারিবে না।

দৃষ্টান্ত : যাহার বার্ষিক আয় ২,০২৪৲ টাকা তাহাকে দিতে হইবে—

প্রথম ১,৫০০৲ টাকার উপর	শূন্য
পরবর্তী ৫২৪৲ টাকার উপর ৯ পাই হারে	২৪॥৴০
মোট আয়—২,০২৪৲ টাকা	মোট ট্যাক্স—২৪॥৴০

কিন্তু মোট আয় ২,০২৪৲ টাকা হইতে ২,০০০৲ টাকা বাদ দিলে ২৪৲ টাকা থাকে এবং আয়-কর তাহার অর্ধেকের বেশী হইতে পারিবে না। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে ১২৲ টাকা আয় কর লাগিবে, ২৪॥৴০ আনা নহে।

অপর দৃষ্টান্ত :—যাহার বার্ষিক আয় ১৬,২০০৲ টাকা তাহাকে দিতে হইবে—

প্রথম ১,৫০০৲ টাকার উপর	শূন্য
পরবর্তী ৩,৫০০৲ টাকার উপর ৯ পাই হারে	১৬৪৴০
তৎপরবর্তী ৫,০০০৲ টাকার উপর ১৫ পাই হারে	৩৯০॥৵০
তৎপরবর্তী ৫,০০০৲ টাকার উপর ২৪ পাই হারে	৬২৫৲
তৎপরবর্তী ১,২০০৲ টাকার উপর ৩০ পাই হারে	১৮৭॥০
মোট আয়—১৬,২০০৲ টাকা	মোট ট্যাক্স—১,৩৬৭৶০

২৫,০০০৲ টাকার উর্ধে বার্ষিক আয় হইলে তাহার উপর সুপার ট্যাক্স লাগে। তাহার জন্য ভিন্ন নিরিখ নির্দিষ্ট আছে।

যে কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করাই করের উদ্দেশ্য নহে; কারণ কর মাত্রেরই সমাজের উপর ভাল কিংবা মন্দ একটা ফল রহিয়াছে। সুতরাং নূতন করের কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিতে হইলেই সমাজের উপর উহার ভাল ও মন্দ উভয়বিধ পরিণাম বিবেচনা করিয়া উহা কার্যে পরিণত করা না করা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কর আদায়ের অধিকার রাষ্ট্রকে তাহার নিজের কোন বিশেষ স্বার্থোদ্ধারের জন্য দেওয়া

কর নির্ধারণে বিচারের আবশ্যকতা

হয় নাই : সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই তাহার হাতে এই মারাত্মক অস্ত্র দেওয়া হইয়াছে। * রাষ্ট্র যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে সমাজের অধিকতম কল্যাণ সাধন করিবেন এই দাবী প্রজাসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট করিতে যেমন অধিকারী তেমনি কোন্ উপায়ে অর্থসংগ্রহ হইবে তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেও তুল্য অধিকারী।

কর নির্ধারণের দুইটি মূল নীতি

এক্ষণে কর্মক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণীর উপর কি প্রকার কর ধার্য করিলে চারিদিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সহজে রাষ্ট্র তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহাই বিবেচ্য। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্বে আমাদিগকে ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির উপর করের তারতম্য হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এমন ভাবে কর ধার্য করা আবশ্যক যাহাতে মানুষ উহা প্রত্যক্ষভাবে সর্বাপেক্ষা কম অনুভব করিতে পারে। অবশ্য এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা এই নীতিকে স্বীকার করেন না, এবং মনে করেন যে রাষ্ট্রীয় জীব হিসাবে নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য মানুষের পক্ষে করভার ভালরূপে অনুভব করাই প্রয়োজন। ইহাতে জ্ঞানতঃ ত্যাগস্বীকার ও কর্ত্তব্যপালনের গৌরব এবং দুষ্কর্মজনিত দণ্ড পাইবার শিক্ষা মানুষ লাভ করিবে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে বিরাট ঋণভার জার্মানীর উপর চাপান হইয়াছিল তাহার প্রতি নির্দেশ করিয়া ইহারা তাহাদের এই যুক্তি সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিলে এইরূপ যুক্তি মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ আধুনিক কালে কোনরূপ অসঙ্গত বা অন্যায় ট্যাক্স ধার্য করিলে প্রজাসাধারণ তাহার ফলে মিতব্যয়িতা শিক্ষা না-করিয়া হয়ত বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে।

---

* প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণ মুৎস্রষ্টু মাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

প্রজাদিগের সম্পদের জন্য তিনি (দিলীপ রাজা) প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন—রবি যেমন রসগ্রহণ করেন সহস্রগুণ দান করিবার জন্য।

আমরা চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি, উচ্চ ঋণভার চাপাইয়া যাহারা জার্মানীর যুদ্ধপিপাসা নিবারণ করিবার আশা পোষণ করিয়াছিলেন তাহাদের সেই আশা নিতান্তই দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে মোটামুটি এই দাঁড়াইতেছে যে, একদিকে ট্যাক্সের পরিমাণ মানুষের আর্থিক অবস্থানু-যায়ী কমবেশী করিতে হইবে এবং অপর দিকে ইহাকে মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির যথাসম্ভব বাহিরে রাখিতে হইবে। এই দুইটি নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই আমরা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম তাহার যথাযথ উত্তর পাইব।

এই সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে, কোন একটি মাত্র ট্যাক্স দ্বারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়, না, কতকগুলি বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। এই সম্পর্কে অগ্রে একক করের কয়েকটি দৃষ্টান্ত একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। প্রথমতঃ আমরা ভূমিকর সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। ইহার সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, ইহা হইতে যথেষ্ট আয় হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা করভার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর ন্যায়সঙ্গত রূপে বিতরিত হইবে না। যে-সব ধনীর ভূসম্পত্তি অপেক্ষা নগদ অর্থ বেশী অথবা যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক তাহারা অল্পেতে রেহাই পাইবেন। ইহার তুলনায় একমাত্র আয়কর দ্বারা রাষ্ট্রের সমগ্র প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা অধিকতর সমীচীন। কারণ ইহা দ্বারা ইচ্ছা করিলে করের হার বাড়াইয়া দিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সকল অর্থ যেমন সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তেমনই অবস্থানুযায়ী সামঞ্জস্য করিয়া ইহা সকলের উপর নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ইহার একমাত্র কুফল এই যে, ইহা মানুষের সঞ্চয়-প্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মূলধন সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে। কারণ এই একটি মাত্র করের দ্বারা যদি রাষ্ট্রের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেকের আয়ের উপর এতটা উচ্চ হারে কর ধার্য

একক ও একাধিক করের সুবিধা অসুবিধা বিচার

করিতে হইবে যে মানুষ তাহার উদ্বৃত্ত আয়ের অধিকাংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা জেদের বশবর্তী হইয়া উহা অপব্যয় বা নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং অধিক পরিশ্রম ও ধনোৎপাদন হইতে বিরত থাকিবে। একক কর সম্বন্ধে তৃতীয় প্রস্তাব হইতেছে, সম্পত্তির মূল্যের উপর একটা বড় কর ধার্য করা ; ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার কবল হইতে সম্পত্তি-বিহীন অথচ উপার্জনশীল বহু ব্যক্তি রেহাই পাইবে। কারণ যে অসংখ্য নরনারী বিদ্যাবুদ্ধি ও নানারূপ বৃত্তিমূলক কর্মশক্তি দ্বারা বহু অর্থ উপায় করিয়া থাকে তাহারা ইহার মধ্যে পড়িবে না। মোটের উপর একক করের সহিত একাধিক কর-নির্ধারণ-নীতির তুলনা করিলে প্রথমতঃ ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, কোন একটি করের হাত হইতে ফাঁকি দিয়া রেহাই পাওয়া যত সহজ, একাধিক করের বেলায় উহা তত সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ একটি মাত্র কর নির্ধারণ দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে যে অসাম্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, একাধিক কর দ্বারা উহা নিবারণ করা যাইতে পারে। অবশ্য ক্ষুদ্র এলাকা ও স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (যথা, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি) কোন কোন ক্ষেত্রে একক কর নির্ধারণ নীতি অনুসরণ করা সুবিধাজনক মনে করিতে পারেন।

আর্থার ইয়াঙ্-এর ন্যায় পণ্ডিত বহু কর নির্ধারণের স্বপক্ষে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে না। তিনি বলেন,

আর্থার ইয়াঙ-এর মত

এক স্থানে অধিক চাপ না দিয়া বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর নির্ধারণ দ্বারা সামান্য চাপ দেওয়াই কর-নির্ধারণের আদর্শ নীতি। একথা বলিবার সময় তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপ অল্পসংখ্যক মাঝারি চাপের চাইতেও মোটের উপর বেশী গুরুতর হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, এরূপ অসংখ্য কর আদায়ের

হাঙ্গামা ও খরচ এবং মানুষের উপর তাহার উপদ্রবের কথাও ভাবিতে হইবে। তাহা হইলে উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,

বিচারের সিদ্ধান্ত

অসংখ্য রকমের কর ধার্য না করিয়া রাষ্ট্রীয় অর্থের জন্য সংখ্যায় পরিমিত অথচ লাভবান কতকগুলি করের উপর নির্ভর করাই সব দিক দিয়া সমীচীন। ধনীর জন্য আয়কর, উত্তরাধিকার-কর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। অন্যদিকে দরিদ্রের জন্য এমন কয়েকটি জিনিসের উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইবে, যে-সব জিনিস তাহাদের স্বাস্থ্য ও যোগ্যতার জন্য অপরিহার্য নয়, অথচ সর্বসাধারণ কর্তৃক সদাসর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জিনিসের উপর কর ধার্য হইলে আয়ও যেমন প্রচুর হইবে, তেমনি বহুলোকের নিকট হইতে তাহা আদায় হইবে বলিয়া ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের উপর অধিক চাপও পড়িবে না। কিন্তু এইরূপ জিনিস বাছাই করিবার সময় এমন কতকগুলি জিনিসকে বাদ দিতে হইবে মানবের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যাহার একান্ত প্রয়োজন আছে। এইরূপ না করিলে মূল্য বৃদ্ধি হেতু দরিদ্রের পক্ষে এই সব জিনিস ভোগ বা ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না, এবং করের মূল উদ্দেশ্যও বিনষ্ট হইবে। এই জন্যই লবণশুল্কের বিরুদ্ধে ভারতবাসী চিরদিন তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে—এই আশঙ্কায় যে ইহা গরিব ভারতবাসীর তুচ্ছ আহার্য বস্তুর অপরিহার্য শেষ উপাদানটুকু পর্যন্ত তাহাদের নিকট দুর্লভ করিয়া তুলিবে। 27 5/47

করভার বণ্টন

পূর্ব প্রবন্ধে করনীতির কয়েকটি প্রাথমিক বা মূলসূত্রের আলোচনা আমরা করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যক্তি কিংবা শ্রেণী বিশেষের মধ্যে করভার কি ভাবে বিতরিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব। কর্তৃপক্ষ যাহার নিকট হইতে কর বা শুল্ক আদায় করেন, তাহাকেই যে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে এই ভার বহন করিতে হয় তাহা সত্য নহে। করের প্রকৃতি ভেদে ইহার ব্যতিক্রম অহরহ ঘটিতেছে এবং অবাঞ্ছিত অতিথির ন্যায় ইহাকে সকলেই নিজ স্কন্ধ হইতে পরস্কন্ধে পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সফলও হইতেছে। এই প্রবন্ধে দেশের বা সমাজের উপর করনীতির সমষ্টিগত ফলাফল বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কোন্ প্রকার কর কাহার দেয়, কোন্‌টির আর্থিক চাপ কাহাকে কোন্ সূত্রে কতখানি বহন করিতে হয়, তাহা আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই সম্পর্কে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন করের পরিমাণ-ফল (effects) ও তাহার ব্যক্তিগত আর্থিক চাপ (incidence or burden) এক জিনিস নহে, যদিও অনেক সময় দুইয়ের সীমা নির্দেশ করা কঠিন।

করের সমষ্টিগত ফলাফল ও ব্যক্তিগত চাপের মধ্যে প্রভেদ

করের চাপ (incidence) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্বে প্রত্যক্ষ চাপ (direct burden), পরোক্ষ চাপ (indirect burden), আর্থিক চাপ (money burden), প্রকৃত চাপ (real burden), প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ (direct money burden), প্রত্যক্ষ প্রকৃত চাপ (direct real burden), পরোক্ষ আর্থিক চাপ (indirect money burden), পরোক্ষ প্রকৃত চাপ (indirect real burden) প্রভৃতি কথার তাৎপর্য আমাদের আয়ত্ত করা আবশ্যক।

করের বিভিন্ন প্রকার চাপ

শেষোক্ত চারিটি পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, অন্য পদগুলির অর্থও সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিকট বোধগম্য হইবে।

প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ কাহাকে বলে তাহাই বিবেচনা করা যাক। আয়কর আর্থিক চাপের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহা যাহার উপর ধার্য হয় তাহাকেই বহন করিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। কিন্তু এই আয়কর যদি অবস্থা-নির্বিশেষে সকলের উপর সমান ভাবে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ইহার প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ সকলের পক্ষে সমতুল্য হইলেও প্রত্যক্ষ প্রকৃত চাপ করদাতার অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হইবে; কারণ ধনীর পক্ষে উহা বহন করা যতটা সহজ দরিদ্রের পক্ষে উহা বহন করা কখনো ততটা সহজ হইতে পারে না। এইখানেই আর্থিক চাপ ও প্রকৃত চাপের মধ্যে পার্থক্য। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টিকে আরও একটু সহজ করিবার চেষ্টা করা যাক। যদি অবস্থানির্বিশেষে সকলকেই এক হারে আয়কর দিতে হয়, তাহা হইলে দুই হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের উপর রামকে যেমন টাকা প্রতি আধ আনা হিসাবে কর দিতে হইবে, দশ হাজার টাকা আয়ের উপর রহিমকেও ঐ একই হারে কর দিতে হইবে। ফলে প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ উভয়ের পক্ষে সমতুল্য হইবে; কিন্তু রামের পক্ষে দুই হাজার টাকা হইতে ৬২॥০ টাকা কর বাবদ দিতে যে-পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, দশ হাজার টাকা হইতে ৩১২॥০ টাকা দিতে রহিমের সে-পরিমাণ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে উভয়ের উপর একই হারে কর নির্ধারিত হইয়া থাকিলেও এবং উভয়ের উপর প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ সমতুল্য হইলেও, প্রকৃত চাপের বিভিন্নতা দাঁড়াইতেছে।

প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ ও প্রত্যক্ষ প্রকৃত চাপ

এক্ষণে আমরা পরোক্ষ আর্থিক চাপ ও পরোক্ষ প্রকৃত চাপ সম্বন্ধে

আলোচনা করিব। পণ্যের উপর যখন শুল্ক ধার্য করা হয়, তখন তাহা মূল্য বৃদ্ধি পাইতেও পারে, না-পাইতেও পারে। কো অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি পায়, আর কোন্ অবস্থায় বৃদ্ধি পা না, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব। য ধরিয়া লওয়া যায় যে শুল্ক নির্ধারণ হেতু জিনিসের মূল্য পূর্বাপেক্ষা বৃ পাইয়াছে, তাহা হইলে দুই রকম অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। যাহার অবস্থাপন্ন তাহারা বর্ধিত মূল্যেই ঐ জিনিস ক্রয় করিয়া নিজেদের প্রয়োজ মিটাইবে; আর যাহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে, তাহারা হয় ঐ জিনিসে ব্যবহার একেবারেই পরিত্যাগ করিবে, নয় হ্রাস করিবে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ক্রেতাগণকে যে মূল্যটা অতিরিক্ত দিতে হইবে উহাকে আমরা পরোক্ষ আর্থিক চাপ, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে ক্রেতাগণকে যে ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে উহাকে পরোক্ষ প্রকৃত চাপ বলিতে পারি। উভয় ক্ষেত্রেই পরোক্ষ চাপ বলিবার কারণ এই যে, এই কর যাহার উপর প্রথমতঃ চাপান হ তাহাকে উহা প্রত্যক্ষ ভাবে দিতে হইয়া থাকিলেও শেষ পর্যন্ত বহন করিতে হয় নাই। কারণ তিনি উহা ক্রেতার উপর পরিচালনা করিয়া দিতে সক্ষ হইয়াছেন এবং ক্রেতাগণ কর বাবদ প্রত্যক্ষ ভাবে এই ভার বহন করে নাই, পণ্যের মূল্য দিবার সময় পরোক্ষ বা গৌণ ভাবে উহার চাপ আসিয় তাঁহাদের উপর পড়িয়াছে। ক্রেতাগণের মধ্যে আবার এক শ্রেণীকে বর্ধিত মূল্যরূপে নগদ অর্থ দ্বারা এই চাপ বহন করিতে হইতেছে বলিয়া তাহাদে ক্ষেত্রে ইহাদিগকে আর্থিক চাপ বলা হইয়াছে; এবং অপরকে অর্থে অভাবে ভোগসামগ্রী হইতে বঞ্চিত থাকিয়া এই করের দাবী মিটাইতে হইতেছে বলিয়া তাহার বেলায় ইহাকে প্রকৃত চাপ বলা হইয়াছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চিনি কিংবা লবণের উপর শুল্ক নির্ধারণের ফলে উহার মূল বৃদ্ধি পাইবার দরুণ যাহারা অধিক মূল্য দিয়াও চিনি বা লবণ পূর্ববৎ ব্যবহা

পরোক্ষ আর্থিক চাপ ও পরোক্ষ প্রকৃত চাপ

করিবেন তাঁহারা সহ করিবেন পরোক্ষ আর্থিক চাপ; আর যাহারা বর্ধিত মূল্যের দরুণ কম চিনি বা লবণ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবেন, তাঁহাদের উপর যে ত্যাগের বোঝা চাপান হইবে তাহারই নাম পরোক্ষ প্রকৃত চাপ।

ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা চিনি—কিংবা লবণ-করের টাকাটা আদায় করিয়া লইতে বিক্রেতার কিছু সময়ের দরকার; অথচ বিক্রেতাকে হয়ত করের টাকাটা পূর্ব্বেই এক থোকে নগদ দিতে হইয়াছে। এই টাকার একটা স্বদ আছে; স্বদ সহ করের টাকা যদি সে ক্রেতার নিকট হইতে উশুল করিতে না পারে, তাহা হইলে স্বদের ক্ষতিটা তাহাকে নিজে বহন করিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে ইহা দাঁড়াইবে পরোক্ষ আর্থিক চাপ। এই ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই পরোক্ষ আর্থিক চাপ বহন করিতে হইতেছে। শুল্কের দরুণ অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া ক্রেতা যেমন এক দিকে এই চাপ বহন করিতেছেন, অন্য দিকে বিক্রেতা শুল্কের বোঝা ক্রেতার উপর পরিচালনা করিয়া দিতে সক্ষম হইয়া থাকিলেও, শুল্কের টাকাটা অগ্রিম দেওয়ায় স্বদের দরুণ আংশিক চাপ তাহার উপরও থাকিয়া যাইতেছে। বিক্রেতা যদি স্বদ সহ শুল্কের টাকাটা ক্রেতার নিকট হইতে উশুল করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য বিক্রেতা এই পরোক্ষ আর্থিক চাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং এক মাত্র ক্রেতাকেই উহা সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে হইবে।

পরোক্ষ আর্থিক চাপের আর একটি নমুনা

সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ ভিন্ন অন্য যে-সব চাপের বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করিলাম তাহাদের কোনটিই ব্যক্তিগত আর্থিক চাপ (incidence or burden) নহে; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগকে করের গৌণ ফল (effects) রূপে গণ্য করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

আমরা পণ্যের উপর নির্ধারিত শুল্ককে পরোক্ষ কর বলিয়া পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি; এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, একের উপর এই কর আরোপিত হইলেও অন্যের উপর ইহা পরিচালনা করিয়া দেওয়া যায় বলিয়াই ইহাকে পরোক্ষ কর বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এই শেষোক্ত মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। যেহেতু পণ্যের উপর নির্ধারিত শুল্ককে সকল সময়ে ক্রেতার উপর পরিচালনা করিয়া দেওয়া চলে না। এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা আমরা এখানে করিব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লবণ-কর সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। লবণের উপর যে পরিমাণ শুল্ক নির্ধারিত হইয়াছে, যদি তাহার ফলে ঠিক সেই পরিমাণ ইহার মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এই শুল্কের ষোল আনাই ক্রেতাকে দিতে হইবে এবং ইহাই পরোক্ষ কর। কিন্তু যদি শুল্ক ধার্যের পরও লবণের মূল্য বৃদ্ধি না পায় ও তদ্দরুণ বিক্রেতাকেই ইহার সমস্তটা শেষ পর্যন্ত বহন করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা প্রত্যক্ষ কর রূপে গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে লবণের মূল্য যদি ঠিক শুল্কের পরিমাণ অনুযায়ী বৃদ্ধি না পাইয়া আংশিক বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে যেটুকু মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ক্রেতাকে এবং বাকিটুকু বিক্রেতাকে ভাগাভাগি করিয়া দিতে হইবে। তখন ইহাকে আংশিক প্রত্যক্ষ ও আংশিক পরোক্ষ কর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এক্ষণে কি কারণে উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে তাহার বিচার করা আবশ্যক।

পণ্যশুল্ক সর্বক্ষেত্রে পরোক্ষ কর কিনা

আমরা জানি, মূল্যের উপর জিনিসের যোগান ও চাহিদা অনেকখানি নির্ভর করে; অর্থাৎ মূল্যের কমি-বেশী তাহার ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের জীবন-ধারণের জন্য এমন কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন আছে, মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও

যাহাদের চাহিদার বিশেষ তারতম্য হইতে দেখা যায় না; কারণ উহাদের প্রয়োজন অপরিহার্য। যথা, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি। আবার অন্যদিকে বিলাস-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মানুষ তাহা কম কিংবা একেবারে না ক্রয় করিয়াও পারে। যথা, মূল্যবান বসন-ভূষণ, আসবাবপত্র ইত্যাদি। যোগানের বেলায়ও কতকগুলি জিনিসের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমা অপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, তৈয়ারী খরচ না পোষাইবার দরুণ তাহাদের যোগান বা সরবরাহ সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আবার কতকগুলি জিনিস আছে যাহাদের যোগান মূল্যের উপর ততটা নির্ভরশীল নয়—মূল্যনির্বিশেষে যাহা প্রায় এক ভাবে সরবরাহ হইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে মজবুত টেকসই, অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীকে আমরা প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং ক্ষয়িষ্ণু, স্বল্পকালস্থায়ী অনতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। যোগান ও চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতাকে ইংরেজীতে elasticity of supply and demand বলা হয়। যখন কোন জিনিসের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় তখন এক দিকে বিক্রেতার চেষ্টা হয় জিনিসের যোগান হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ঐ করভার ক্রেতার উপর আরোপ করিয়া দিবার জন্য; অন্য দিকে ক্রেতাদের চেষ্টা হয়, চাহিদা হ্রাস করিয়া ঐ করভার বিক্রেতার উপর রাখিয়া দিবার জন্য। উভয় পক্ষের প্রতিযোগিতার সফলতা তখন নির্ভর করে জিনিসের প্রকৃতি এবং উহার যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তনশীলতা বা গুরুত্বের উপর।

পণ্যের প্রকৃতি ভেদে যোগান ও চাহিদার তারতম্য ও পণ্যশুল্কের অবস্থান্তর

তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, চাহিদা যতই অস্থির বা পরিবর্তনশীল হইবে পণ্যের উপর নির্ধারিত কর ক্রেতার উপর চাপান ততই কঠিন হইবে এবং উহা বিক্রেতার উপর থাকিয়া

যাইবে। কারণ বিক্রেতা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেই ক্রেতাগণ উহা ক্রয় করিতে বিরত হইবে ও সেই জন্যই বিক্রেতার পক্ষে ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য হইবে না। অপর পক্ষে, যতই কোন জিনিসের যোগান বা সরবরাহ অস্থির ও পরিবর্তনশীল হইবে, ততই কর নির্ধারণের দরুণ উহার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা ক্রেতাগণের পক্ষে কঠিন হইবে। কারণ চাহিদার তুলনায় যোগান অধিকতর পরিবর্তনশীল হইলে লোকে উহা অধিক মূল্য দ্বারাও ক্রয় না করিয়া পারিবে না, পাছে যোগান হ্রাস প্রাপ্ত হয় কিম্বা একেবারে বন্ধ হয়।

দৃষ্টান্ত :—আমাদের দেশে লবণের উপর নির্ধারিত শুল্কের প্রায় সবটাই ক্রেতাকে দিতে হয় ; কারণ লবণ এমন একটি জিনিস যাহা অতি দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষেও ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং বিক্রেতা যখন লবণের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এই কর ক্রেতার উপর চাপাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহার এই চেষ্টা ক্রেতা প্রতিরোধ করিতে পারে না। কারণ যোগানের তুলনায় লবণের চাহিদা অধিকতর অপরিবর্তনশীল,—একপ্রকার অপরিবর্তনীয় (inelastic) বলিলেও চলে ; কারণ লবণ ব্যতিরেকে কাহারো একবেলাও চলে না। কিন্তু যদি মোটরগাড়ীর উপর উচ্চ কর নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে ইহার বিক্রয়ের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। কারণ ইহার প্রয়োজন সকলের পক্ষে অপরিহার্য নহে, এবং এইরূপ মূল্যবান জিনিস অধিকতর মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার ক্ষমতা সমভাবে সকলের থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে মোটরের চাহিদা যোগানের তুলনায় অধিকতর পরিবর্তনশীল। সেই জন্যই মোটর-বিক্রেতা এই কর ক্রেতার উপর পরিচালনা করিতে কখনও ততটা সক্ষম হইবে না যতটা লবণ-বিক্রেতা সক্ষম হইবে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা অধিকন্তু এই সিদ্ধান্তও করিতে পারি যে, পণ্যের উপর নির্ধারিত শুল্কের প্রত্যক্ষ আর্থিকচাপ ঐ পণ্যের

যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্বের অনুপাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিভক্ত হইবে। * অর্থাৎ যদি কোন পণ্যের যোগান ও চাহিদার গুরুত্ব বা পরিবর্তনশীলতা সমতুল্য হয়, তাহা হইলে পণ্যের মূল্য শুল্কের অর্ধেক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ঐ শুল্ক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে সম-পরিমাণে বহন করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত

বিষয়টিকে আরও খানিকটা সহজভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। যদি ধরা যায় সোলার টুপির মূল্য ২৲ টাকা ও কর্তৃপক্ষ তাহার উপর ৶০ আনা হিসাবে শুল্ক ধার্য করিয়াছেন, তাহা হইলে উহার মূল্য ২৲ টাকাই থাকিবে কিংবা উহার মূল্য চড়িবে, ও চড়িলে কতটা চড়িবে, এই সব প্রশ্নের জবাব নির্ভর করিবে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরের উপর:—সোলার টুপির চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তনশীল কি না? অর্থাৎ ইহা ক্রয় না-করা যতটা ক্রেতার ইচ্ছাধীন, বিক্রয় না-করা ততটা বিক্রেতার ইচ্ছাধীন কি না? যদি মূল্যের কারণে ক্রেতার ক্রয় করা-না-করা ও বিক্রেতার বিক্রয় করা-না-করা সমভাবে নির্ভর করে, তাহা হইলে উভয়কে এই ৶০ আনা শুল্ক তুল্যরূপে ভাগাভাগি করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ টুপির মূল্য দাঁড়াইবে ২/১০ আনা—যদ্দরুণ শুল্ক মধ্যে ক্রেতাকে দিতে হইবে /১০ আনা, বিক্রেতার উপর থাকিয়া যাইবে /১০ আনা। যদি ক্রয় না-করার ইচ্ছাই বিক্রয় না-করার ইচ্ছা অপেক্ষা দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে টুপির মূল্য বাড়িবে মাত্র /০ আনা—ফলে ক্রেতাকে দিতে হইবে শুল্কের /০ আনা ও বিক্রেতাকে দিতে হইবে তাহার দ্বিগুণ ৵০ আনা। আর যদি ক্রয় না-করার ইচ্ছা বিক্রয় না করার ইচ্ছা অপেক্ষা ষোল আনাই প্রবল হয়, তাহা হইলে বিক্রেতাকে ষোল আনা শুল্কই বহন করিতে

* "The direct money burden of a tax imposed on any object is divided between the buyers and the sellers in the proportion of the elasticity of supply of the object taxed to the elasticity of demand for it"—Dalton

হইবে, কারণ ক্রেতার ইচ্ছা এখানে সর্বশক্তিমান; বিক্রেতার স্বাধীন বিবেচনার কোন উপায় নাই, পূর্বেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন জিনিসের উপর নির্ধারিত শুল্কের একটা অংশ ক্রেতা বা বিক্রেতা ভিন্ন অপরের উপর গিয়াও পড়িতে পারে। যেমন প্রসাধন-দ্রব্যের উপর নির্ধারিত করের একটা অংশ শিশি ও কৌটা ইত্যাদি সরবরাহকারীদের বহন করিতে হইতে পারে। কারণ করের দরুণ প্রসাধন-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু উহাদের চাহিদা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে জিনিসের তৈরি খরচ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুত-কারিগণ শিশি ও কৌটা কম মূল্যে ক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে এবং এইরূপে নির্ধারিত করের একটা অংশ শিশি কৌটা বিক্রেতার উপরে গিয়া পড়িবে। একটি করের ফল কতটা সুদূর প্রসারী হইতে পারে ইহা হইতে আমরা তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

পণ্যশুল্কের সুদূর প্রসারী প্রভাব

পণ্যদ্রব্যের উপর নির্ধারিত কর, আদিতে ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা যাহার উপরই ধার্য হউক না কেন, পরিণামে ইহা কাহার দেয় তাহা উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী স্থির হইবে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে একের উপর নির্ধারিত কর অপরের উপর পরিচালনা করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ (Every tax sticks where it falls for a time) এবং ইহা কতটা তাড়াতাড়ি বিক্রেতা ক্রেতার উপর কিংবা ক্রেতা বিক্রেতার উপর পরিচালনা করিতে পারিবে, তাহাও নির্ভর করিবে জিনিসের প্রকৃতি, উহার চাহিদা ও যোগানের অবস্থা ও পরিবর্তনশীলতার উপরই।

দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য নীতি আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। দেশের ভিতর উৎপন্ন পণ্যের উপর নির্ধারিত শুল্ক (Excise duty) এবং বৈদেশিক

আমদানি ও রপ্তানির উপর নির্ধারিত শুল্ক (Import and Export duty), এই উভয়বিধ করের চাপও উল্লিখিত নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা বলিতে ব্যক্তিবিশেষকে না বুঝিয়া দেশবিশেষকে বুঝিতে হইবে এবং যে-দেশ পণ্য বিদেশ হইতে আমদানি করে তাহাকে ক্রেতা এবং যে-দেশ বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে তাহাকে বিক্রেতা মনে করিতে হইবে। এইরূপ আন্তর্জাতিক পণ্য-সরবরাহে এক জিনিসের মূল্য সাধারণতঃ অপর জিনিস দ্বারা পরিশোধিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগান ও চাহিদার পরিবর্তনশীলতা (elasticity) বিবেচনা করিবার সময় উভয় দেশের মধ্যে যে পণ্যের আদান-প্রদান হইয়া থাকে তাহাদের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তার উপর এক দেশ অপর দেশের উপর কোন কর পরিচালনা করিতে পারিবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে।

আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক কাহারা দেয়

দৃষ্টান্ত—জাপান তাহার বস্ত্রশিল্পের জন্য বহু পরিমাণ তুলা ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করে এবং তদ্বিনিময়ে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সূতা ও বস্ত্র ভারতবর্ষে রপ্তানি করিয়া থাকে। এক্ষণে ভারতবর্ষ যদি জাপানী সূতা ও বস্ত্রের উপর আমদানি-শুল্ক ধার্য করে, তাহা হইলে এই শুল্ক জাপানকেই প্রকৃত প্রস্তাবে দিতে হইবে কিংবা এই শুল্কের বোঝা পরিণামে ভারতবাসীদের উপরই আসিয়া চাপিবে, তাহা নির্ভর করিবে ভারতবর্ষে জাপানী সূতা ও বস্ত্রের চাহিদার পরিবর্তনশীলতা (elasticity) ও গুরুত্বের উপর। অর্থাৎ আমদানি-শুল্কের দরুণ জাপানী বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যদি ইহা অপেক্ষা সস্তায় নিজের দেশে তৈরি কিংবা ভিন্ন দেশ হইতে আমদানী বস্ত্র ভারতবাসীরা ক্রয় করিতে না পায় এবং অধিক মূল্যে পূর্ব্ববৎ জাপানী বস্ত্র আমদানি করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এই আমদানি-শুল্কের

সবটাই ভারতবাসীকে দিতে হইবে। পক্ষান্তরে মূল্য বৃদ্ধি হেতু ভারতবর্ষে যদি জাপানী বস্ত্রের চাহিদা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বাজার হাতে রাখিতে হইলে এই শুল্ক জাপানকেই বহন করিতে হইবে, এবং ইহাকে তৈয়ারী খরচের মধ্যে ধরিয়া লইয়া কাপড়ের মূল্য কম রাখিবার জন্য তাহাকে অন্যদিকে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যক্ষেত্রে কোন কোন পণ্যশুল্ক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই যেমন আংশিক ভাবে দিতে হয়, সেইরূপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও কোন কোন জিনিসের উপর আমদানি কিংবা রপ্তানি শুল্ক উভয় দেশকেই বহন করিতে হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক্, জাপানী বস্ত্রের জোড়া ভারতবর্ষের বাজারে ১॥০ দেড় টাকা দরে বিক্রয় হয় এবং ঐ নমুনার ভারতীয় বা ভিন্ন দেশীয় কাপড়ের জোড়া ১॥/০ এক টাকা নয় আনা মূল্যের কমে পাওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রে যদি জাপানী বস্ত্রের উপর জোড়া প্রতি ৵০ আনা হারে আমদানি-শুল্ক ধার্য হয়, তাহা হইলে জাপান /১০ আনা শুল্ক নিজের উপর রাখিয়া বাকি ৴১০ আধ আনা কাপড়ের মূল্যের উপর চাপাইয়া দিতে পারে। ফলে জাপানী কাপড়ের মূল্য ১॥০ স্থলে ১॥১০ হইলেও তুলনায় সস্তা হইবে এবং ভারতবাসীকে জোড়া প্রতি এই আধ আনা শুল্ক দিতে হইবে। আর জাপানকে দিতে হইবে /১০ আনা। পক্ষান্তরে ভারতীয় তুলার উপর যদি জাপান কোনরূপ আমদানি-শুল্ক কিংবা ভারতবর্ষ কোনরূপ রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করে, তাহা হইলে উহা পরিণামে কাহাকে দিতে হইবে তাহা নির্ভর করিবে ভারতীয় তুলার যোগান ও জাপানী চাহিদার পরিবর্তনশীলতার (elasticity-র) উপর। অর্থাৎ আমাদের তুলা বেচিবার ও জাপানের তুলা কিনিবার ইচ্ছা বা গরজের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর।

সাধারণ মানুষের মনে এইরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, বিদেশী জিনিসের উপর আমদানি-শুল্ক ধার্য করিলে যে-দেশ ইহা ধার্য করে সেই দেশকেই এই শুল্ক দিতে হয়; বিদেশী বিক্রেতাকে তাহা দিতে হয় না। কারণ বিদেশী বিক্রেতা শুল্কের পরিমাণ অনুযায়ী তাহার জিনিসের দর চড়া করিয়া দেয় এবং সেই চড়া দরেই উহা আমদানি হইয়া থাকে। এই অবস্থা তখনই সম্ভবপর যখন কোন দেশে অন্যান্য দেশের পক্ষে অপরিহার্য এমন কোন জিনিস উৎপন্ন হয়। সেই ক্ষেত্রে ঐ প্রকার জিনিসের উপর অন্যান্য দেশ আমদানি-শুল্ক ধার্য করিতেই সাহসী হইবে না; অধিকন্তু ঐ ভাগ্যবান দেশই যদি পাল্টা ঐ জিনিসের উপর রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করে তাহা হইলেও উহার সমস্তটা অন্যান্য দেশকেই বহন করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ ভাগ্যবান দেশ যদি অন্য দেশ হইতে আমদানী জিনিসের উপর শুল্ক ধার্য করে তাহা হইলে ঐ শুল্কও অন্য দেশকেই বহন করিতে হইবে। ইহার কারণ পূর্ব উল্লিখিত সূত্রের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। ভাগ্যবান দেশের জিনিসটির জন্য অন্যান্য দেশের চাহিদার অপরিহার্যতাই (inelasticity) ইহার কারণ। পাট বাংলা দেশের একচেটিয়া সম্পদ। ইহার উপর সেই জন্যই ভারত-সরকার রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করিতে সাহসী হইয়াছেন। কারণ এই শুল্ক দিয়াও বিদেশীকে পাট গ্রহণ করিতে হইবে, যে পর্যন্ত পাটের বদলি আর কোন জিনিস উহারা নিজের দেশে আবিষ্কার ও ব্যবহার করিতে না পারিতেছে।

আমদানি-শুল্ক সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা।

এই সম্পর্কে আর একটি সাধারণ সূত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, যে-দেশ পাকা মাল বিদেশে রপ্তানি করে এবং কাঁচা মাল ও খাদ্যসামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকে, সেই দেশ যদি বিদেশী জিনিসের উপর আমদানি-শুল্ক ও নিজেদের জিনিসের উপর

রপ্তানি-শুল্ক ধার্য করে, তাহা হইলে এই উভয় শুল্কের চাপ প্রধানতঃ তাহার নিজের উপরই পড়িবে। তাহার কারণ এই যে, কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন তাহার পক্ষে যতটা, তাহার প্রস্তুত পাকা মালের প্রয়োজন বিদেশে ততটা না-হইবার সম্ভাবনা। পাকা মাল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন কাঁচা মালের; সুতরাং কাঁচা মালের চাহিদা ও দাবি অধিকতর প্রবল ও অগ্রগণ্য। বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের আশঙ্কায় কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব আরও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একই কারণে উল্লিখিত সূত্রেরই উত্তর ফল বা পরিণতি হিসাবে আমরা ইহাও ধরিয়া লইতে পারি যে, যে-দেশ খাদ্য ও কাঁচা মাল রপ্তানি এবং পাকা মাল আমদানি করিয়া থাকে সেই দেশ রপ্তানি ও আমদানি উভয় শুল্কের অনেকটাই বিদেশীর উপর পরিচালনা করিয়া দিতে পারিবে।

> কাঁচা ও পাকা মালের উপর আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের ভিন্ন ফলাফল

অনেক সময় পণ্যের উপর নির্ধারিত শুল্ক বিক্রেতার নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা একবারে আদায় করিয়া লওয়া হয়। কোন্ অবস্থায় এই কর বিক্রেতা ক্রেতার উপর চালনা করিয়া দিতে সক্ষম হইবে তাহাও পূর্ব উল্লিখিত যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন--কিংবা অপরিবর্তনশীলতার (relative elasticity or in-elasticity of demand and supply-র) উপর নির্ভর করিবে। শুল্কের যে-টাকাটা বিক্রেতা অগ্রিম দিয়াছে তাহা সুদ সহ সে ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে কি না তাহাও নির্ভর করিবে সেই একই সূত্রের উপর। জিনিসের চাহিদার অপরিহার্যতার দরুণ যদি বিক্রেতা তাহার প্রদত্ত সমস্ত শুল্ক সুদ সহ বিক্রেতার নিকট হইতে উশুল করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ জিনিসের মূল্য শুল্ক অপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

> কোন্ ক্ষেত্রে পণ্য-মূল্য নির্ধারিত শুল্ক অপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি পায়

নির্ধারিত শুল্ক অপেক্ষাও জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার আরও দু-তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কতকগুলি জিনিস আছে যাহা যত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় ততই গড়পড়তা তাহার নির্মাণ-খরচ হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপ জিনিসের মূল্য স্থির করিবার সময় নির্ধারিত করের উপর আরও কিছু ধরিয়া দিলেও উহার বিক্রয়ের পক্ষে অসুবিধা হইবার কথা নহে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন নূতন করের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা শুধু তাহাদের প্রতিবাদ জানাইবার জন্য জিনিসের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য ক্রেতা-সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া ঐ করের হ্রাস কিংবা প্রত্যাহার ঘটান।

স্বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী জিনিসের উপর আমদানি শুল্ক বসাইলে অন্যান্য জিনিসের আমদানি হ্রাস পাইবে এবং স্বর্ণের আমদানি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ঐ দেশে জিনিসের মূল্য আমদানি শুল্কের পরিমাণ অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে।

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রসমূহে শ্রমিক-বীমার (Social Insuranceএর) দরুণ মালিক ও শ্রমিক উভয়ে প্রত্যক্ষভাবে যে টাকা দিয়া থাকে তাহার প্রকৃত চাপ পরিণামে কাহার উপর কতটা আরোপিত হয় তাহার বিচার করা যাইতে পারে। শ্রমিকগণ যে টাকা দেয় উহা তাহার মজুরীর উপর ট্যাক্স বলিয়া ধরা যাইতে পারে; পক্ষান্তরে মালিকের দেয় অর্থকে কর্ম-বিনিয়োগ-কর (employment tax) রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ শ্রমিকের যোগান অপেক্ষা চাহিদা অধিকতর পরিবর্তনশীল (elastic)। শ্রমিকগণ গরিব, জীবিকার জন্য কাজ না-করিয়া তাহাদের উপায় নাই; পক্ষান্তরে মালিকগণ ধনী ও প্রতিপত্তিশালী। সুতরাং মজুরী সম্বন্ধে শ্রমিকের দাবি অপেক্ষা মালিকের দয়া অধিকতর গ্রাহ্য এবং

শ্রমিক বীমার প্রকৃত চাপ কাহার বহনীয়

মালিক একটা নির্দিষ্ট মজুরী অপেক্ষা বেশী দিতে না চাহিলেও শ্রমিককে অনেক ক্ষেত্রে উহা মানিয়া লইয়াই কর্মগ্রহণ করিতে হয়। তাহারই ফলে মালিকের উপর নির্ধারিত বীমা-করেরও একটা প্রধান অংশ পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের উপর গিয়াই পড়ে। অর্থাৎ মালিকরা শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণের সময় তাহাদের দেয় বীমা-করের অন্ততঃ খানিকটা মজুরী হ্রাস করিয়া দিয়া পূরণ করিয়া লন। ফলে শ্রমিকদিগকে নিজাংশের বীমা-কর ত দিতেই হয়, উপরন্তু মজুরী হ্রাস হেতু মালিকের অংশের দেয় করও আংশিক কিংবা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের উপরই আসিয়া পড়ে। শ্রমিকের চাহিদার পরিবর্তনশীলতা (elasticity) যোগানের পরিবর্তনশীলতা অপেক্ষা অধিক কিংবা মালিকের শ্রম-খরিদের গরজ অপেক্ষা শ্রমিকের শ্রম-বিক্রয়ের গরজ বেশী বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও আমরা পূর্বোল্লিখিত সূত্রেরই প্রয়োগ দেখিতে পাইতেছি। অর্থাৎ পণ্যের উপর নির্ধারিত শুল্কের প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ ঐ পণ্যের (এখানে শ্রমের) যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্বের অনুপাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিভক্ত হইবে।

কর-নির্ধারণ রীতি

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি ও সম্প্রদায় মধ্যে দেশের করভারকে কি ভাবে ন্যায়সঙ্গতরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু সেই আলোচনা করিবার পূর্বে কোন্ করের চাপ কাহার উপর কতখানি পড়িতেছে বা পড়িবে তাহা জানা আবশ্যক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কতকগুলি কর আছে যাহা নির্ধারিত ব্যক্তিকেই দিতে হয়, অপরের উপর তাহা পরিচালনা করিয়া দেওয়া চলে না। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ কর (direct tax) বলা হয়। আয়কর (Income tax), সম্পত্তিকর (Property tax), উত্তরাধিকার কর (Inheritance tax) ইহার অন্তর্ভুক্ত। আবার কতকগুলি কর আছে যাহা একজনের উপর ধার্য হইলেও এবং তিনিই ইহা প্রত্যক্ষভাবে দিলেও, পরিণামে এই করের চাপ অপর ব্যক্তির উপরে যাইয়া পড়ে। ইহাকে পরোক্ষকর (Indirect tax) বলা হয়। নানাবিধ পণ্য দ্রব্যের উপর নির্ধারিত শুল্ককে এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যাইতে পারে; যথা চিনি বা লবণের উপর ধার্য শুল্ক বিক্রেতার উপর চাপান হইলেও পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি হেতু ইহা ক্রেতাকেই দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক করের আর্থিক চাপ (money burden) ও প্রকৃত চাপ (real burden)-এর পার্থক্যটাও মনে রাখিতে হইবে। ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিকে যদি একই হারে কর দিতে হয় তাহা হইলে উভয়ের উপর আর্থিক চাপ সমপরিমাণ হইলেও প্রকৃত চাপ সম্বন্ধে অনেকখানি পার্থক্য ঘটিবে। তাই কর নির্ধারণ ব্যাপারে ন্যায় বিচার করিতে হইলে শুধু আর্থিক চাপের দিকে তাকাইলে চলিবে না, প্রকৃত চাপের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

করের ন্যায় সঙ্গত বণ্টনে আর্থিক চাপই একমাত্র বিচার্য নহে, প্রকৃত চাপও বিবেচ্য

যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে দেশের আয়-ব্যয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর এবং প্রত্যক্ষ করের আর্থিক চাপ ও প্রকৃত চাপ কাহার উপর কতখানি পড়িতেছে মোটামুটি তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে, তাহা হইলেও প্রশ্ন হইবে, পরোক্ষকরের আর্থিক ও প্রকৃত চাপ নির্ণয় করা যাইবে কি প্রকারে?

পরোক্ষকরের আর্থিক ও প্রকৃত চাপ নির্ধারণে অসুবিধা

কারণ পরোক্ষ কর, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, একের উপর ধার্য করা হইলেও অনেক সময়ে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উহা অপরের উপর পরিচালনা করিয়া দেওয়া চলে। সুতরাং ইহার গতিবিধি দুর্জ্ঞেয় এবং পরিণামে উহার চাপ কাহার উপর কতখানি পড়িবে তাহা বলা দুঃসাধ্য। সেই জন্যই কর নির্ধারণ সম্পর্কে আদর্শনীতি অনুসন্ধান করিবার কালে প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ (direct money burden)-কে ভিত্তি করিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার বাহিরে অনেকখানি রাজ্য আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার বহির্ভূত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু উপায় নাই। সেই জন্যই কর নির্ধারণে প্রায় সর্বদেশে ও সর্বকালে বহু বৈষম্য, অসঙ্গতি, অন্যায় চলিয়া আসিয়াছে এবং দলাশ্রিত চতুর রাষ্ট্রপতিরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কিছু করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে।

পরোক্ষ আর্থিক চাপের নিয়ন্ত্রণ যখন আমাদের সাধ্যাতীত, তখন আমাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে প্রত্যক্ষ আর্থিক চাপ ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে কি ভাবে বণ্টন করা যাইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা যাক। কিন্তু আমরা এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি যে করের ন্যায়-সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে উহার আর্থিক চাপের দিকে দেখিলেই শুধু চলিবে না, উহার প্রকৃত চাপ সম্বন্ধে আমাদিগকে অধিকতর অবহিত হইতে হইবে। আরো

...ক চাপ ও প্রকৃত চাপ এবং ন্যূনতম ত্যাগনীতি

একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক। দুইটি বিভিন্ন কর হইতে আমরা হয়ত মোটের উপর সম-পরিমাণ অর্থই আদায় করিতে পারিব। কিন্তু এই দুইটি করের সমষ্টিগত আর্থিক চাপ দেশের উপর সমান হইলেও, উভয় করের প্রকৃত চাপের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য থাকিতে পারে। একটি কর ধনীদের উপর হইতে প্রধানতঃ আদায় হইতে পারে। অপরটি হয়ত দরিদ্র সাধারণের উপর হইতে আদায় হইতেছে। সুতরাং আর্থিক চাপ উভয় ক্ষেত্রে সমপরিমাণ হইলেও প্রকৃত চাপ প্রথোমক্ত ক্ষেত্র অপেক্ষা শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনেক গুণ বেশী পড়িয়াছে। সেই জন্যই অনেকে মনে করেন যে রাজস্ব-নীতি এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় যাহার সমষ্টিগত প্রকৃত চাপ দেশের উপর যথাসম্ভব কম পড়িবে। ইংরাজীতে ইহাকে principle of minimum sacrifice (ন্যূনতম ত্যাগনীতি) বলা হয়। ইহার সার কথা এই যে, আয়ের একটা সীমা নির্দেশ করিয়া তদতিরিক্ত সাকুল্য আয় করের সহায়তায় হ্রাস করিয়া ফেলিতে হইবে এবং ঐ নির্দিষ্ট আয় অপেক্ষা ন্যূন আয়ের উপর কোন কর নির্ধারণ করা হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক যে, দু'হাজার টাকার নিম্নে বাৎসরিক আয় হইলে কাহাকেও আয়কর দিতে হইবে না ; পক্ষান্তরে উহার অধিক যাহার যত টাকা আয় হইবে তাহাকে ইহার সমস্তটাই কর স্বরূপ দিতে হইবে। ইহার ফল হইবে এই যে, দু'হাজার টাকার অধিক বাৎসরিক আয় কাহারও থাকিতে পারিবে না। এই নীতির দ্বারা সকলের মধ্যে প্রকৃত চাপের বৈষম্য বিদূরিত হইয়া অনেকখানি সমন্বয় সাধিত হইলেও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত যে ইহার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিবে। কারণ যে মূলধন দেশের কৃষি ও শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সঞ্চয়ের দ্বারা সেই মূলধন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এবং

এই নীতির কুফল ও অন্যায্যতা

অধিকতর শ্রমের দ্বারা অধিকতর পণ্য ও ধনোৎপাদনের উদ্যম ও প্রচেষ্টা, এই নীতি দ্বারা স্বভাবতঃই ব্যাহত হইবে। ন্যায় ও সুবিচারের দিক হইতে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত কিনা—বিশেষতঃ যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত ধনাধিকার বর্তমান রহিয়াছে—তৎ সম্পর্কেও যথেষ্ট মতদ্বৈধ রহিয়াছে। সমাবস্থাপন্ন লোকের প্রতি একই প্রকার আচরণ এবং বিভিন্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাহাদের অবস্থার তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার আচরণ—ইহাকেই যদি ন্যায়সঙ্গত সূত্ররূপে মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও একটা সীমার উর্ধে মানুষের শ্রমোপার্জিত সমস্ত আয়টাই করের দোহাই দিয়া জোর-পূর্বক কাড়িয়া নেওয়ার নীতিকে সমর্থন করা চলে না। কারণ ইহার দ্বারা দুই হাজার টাকার উর্ধে যাহাদের আয় তাহাদের সকলকেই এক পর্যায়ভুক্ত করা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া আমরা যাহা মানিয়া লই তাহার মধ্যেও অনেক সময়ে অনেকখানি ফাঁকি থাকিয়া যায়। ধরা যাক দুইটি ব্যক্তির আয় সমতুল্য এবং উভয়কে একই হারে কর দিতে হয়। ইহার মধ্যে একের প্রতি সদাশয়তা ও অপরের প্রতি জুলুম করা হইতেছে তাহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থা অন্যরূপও হইতে পারে। কারণ আর্থিক আয় সমতুল্য হইলেও অন্যান্য অবস্থার পার্থক্যের দরুণ উহার প্রকৃত চাপ উভয়ের উপর বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। এক হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট বৃহৎ পরিবারের কর্তার পক্ষে বার্ষিক একশত টাকা আয়কর যতখানি পীড়াদায়ক, ঐ আয়বিশিষ্ট কিন্তু সর্বপ্রকার দায়বিমুক্ত অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে ঐ পরিমাণ কর সম-পীড়াদায়ক নিশ্চয়ই হইতে পারে না। এইরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং শুধু ন্যায়ের দৃষ্টিতে শুল্কনীতি নিয়ন্ত্রণ কিম্বা কর নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে।

কোন দেশের রাজস্ব-নীতির ন্যায়পরতা সম্পর্কে আমরা যখন আলোচনা করি তখন তদ্দেশে প্রচলিত সর্বপ্রকার করের সমষ্টিগত ফলের দ্বারা তাহার বিচার করাই বিধেয়; দু'চারিটি বিশেষ কোন করের ফলাফল দ্বারা নহে। তৎসত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে পৃথক-ভাবে কোন কোন করের পরীক্ষা করিয়া তাহার ন্যায় অন্যায় নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন আকস্মিক পড়ে-পাওয়া-ধনের (windfall wealth-এর) উপর যদি খুব উচ্চ কর ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে ন্যায়ের দিক হইতে আমরা কোন প্রকারেই সমর্থনের অযোগ্য মনে করিতে পারি না। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময়ে যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহ করিয়া অনেকেই প্রায় রাতারাতি এইরূপ ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহাদের অতিরিক্ত ধনের উত্তাপে ভূসম্পত্তির মূল্যও অকস্মাৎ কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই প্রকার ধনলাভ মালিকের শ্রম ও মূলধন প্রসূত ন্যায্য উপার্জনরূপে গণ্য হইতে পারে না। ইহাকে আমরা অনুপার্জিত ধন (un-earned income) রূপে গ্রহণ করিতে পারি। ইহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ন্যায়সঙ্গত দাবীর বহির্ভূত। এইরূপ আয়ের উপর উচ্চহারে করনির্ধারণ ন্যায় ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য। কেবল মাত্র একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অপ্রত্যাশিত পড়ে-পাওয়া-ধন বা সম্পত্তির উপর একই নীতি অনুসারে কর নির্ধারণ করিতে হইবে। কতকগুলিকে বাদ দিয়া আর কতকগুলিকে ধরিলে চলিবে না। ঘোড়দৌড়, লটারী প্রভৃতি হইতে অনেক ভাগ্যবানের যে অপ্রত্যাশিত ধনাগম হয় তাহার জন্য বিশেষ করের ব্যবস্থা এদেশে এবং অনেক দেশেই নাই। এই সব অনুপার্জিত হঠাৎপ্রাপ্ত প্রভূত ধনের উপর বিশেষ উচ্চহারে কর নির্ধারণ মোটেই অসঙ্গত নহে।

পড়ে পাওয়া ধন ও তাহার উপর নির্ধারিত কর

প্রকৃত চাপের বিচার বর্তমানে ছাড়িয়া দিয়া কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে আর্থিক চাপ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর ন্যায়সঙ্গতরূপে বিতরণ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়েই প্রথমতঃ আলোচনা করা যাক্। এই সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন প্রস্তাব করা হইয়া থাকে : যথা—(১) প্রত্যেক করদাতার হিতার্থে কর্তৃপক্ষকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয় সেই পরিমাণ অনুযায়ী প্রত্যেকের উপর কর নির্ধারণ ;

আর্থিক চাপের ন্যায়সঙ্গত বিতরণ সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব

(২) প্রত্যেক করদাতা কর্তৃপক্ষ হইতে যে পরিমাণ সুযোগ ও সহায়তা লাভ করিয়া থাকে তদনুযায়ী কর নির্ধারণ ;

(৩) প্রত্যেকের কর দিবার ক্ষমতানুযায়ী কর নির্ধারণ।

প্রথমোক্ত নীতি ন্যায়সঙ্গত হইলেও কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ কর দানের বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃপক্ষ হইতে আমরা এমন কিছু লাভ করি না যাহা পরিমাপ করা যায়। পুলিশ, সৈন্যসামন্ত, আইন আদালত প্রভৃতির জন্য কর্তৃপক্ষ যে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন তদ্দরুণ প্রত্যেকের কি পরিমাণ লাভ হইয়াছে পৃথকভাবে তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। অবশ্য কর্তৃপক্ষ হইতে নগদ মূল্য দ্বারা যেখানে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিদান ক্রয় করা যায় সেইখানেই শুধু এই নীতি প্রযোজ্য। সরকারী ডাক-বিভাগ, রেলবিভাগ, সেচ বিভাগ হইতে আমরা যে কাজ পাইয়া থাকি তাহার মূল্য কর্তৃপক্ষ প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী আমাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় সূত্রটিও সেই একই কারণে অপ্রযোজ্য ; কারণ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কর-দাতার হিতার্থে পৃথকভাবে কি পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নির্ণয় করা যেরূপ দুরূহ, তেমনই প্রত্যেক করদাতা কর্তৃপক্ষ হইতে পৃথকভাবে কি পরিমাণ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা নির্ধারণ করাও সেইরূপই দুরূহ। একারণে আমরা

একণে তৃতীয় সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন এই যে, বিভিন্ন মানুষের পক্ষে কর বহন করিবার বিভিন্নরূপ ক্ষমতার পরিমাপ করা যাইবে কি প্রকারে? কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া কতখানি ত্যাগের কথা প্রত্যেককে বলা যাইবে? ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ চারিটি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন:

ত্যাগ প্রস্তাব সম্পর্কে চারিটি নীতি

(১) সমত্যাগ (Equal Sacrifice)

(২) সমানুপাতিক ত্যাগ (Proportional Sacrifice)

(৩) ন্যূনতম ত্যাগ (Minimum Sacrifice)

(৪) অ-হস্তক্ষেপ ("Leave them as you find them" or "do not alter the distribution of income by taxaton")

১। সমত্যাগ নীতি

সমত্যাগনীতি অনুযায়ী আর্থিক চাপ এমনভাবে বণ্টন হওয়া আবশ্যক যাহার ফলে উহার প্রকৃত চাপ সকলের উপর সমভাবে পতিত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন সকলের সমপরিমাণ অর্থ ত্যাগ করা নহে; সমপরিমাণ কল্যাণ বা সুখস্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করা। রামের সুখস্বচ্ছন্দতা বা আর্থিক কল্যাণের পরিমাণ যদি আমরা ১০০ বলিয়া ধরিয়া লই এবং শ্যামের কল্যাণের পরিমাণ ২০০ শত, তাহা হইলে উভয়কেই এই নীতি অনুযায়ী সমপরিমাণ আর্থিক কল্যাণ বা সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ রামকে যদি ১০টি সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে শ্যামকে, যদুকে, রহিমকে সবাইকে সেই পরিমাণ সুখস্বচ্ছন্দতা ছাড়িতে হইবে। সমানুপাতিক ত্যাগনীতি অনুসারে প্রকৃত চাপ প্রত্যেক করদাতার আয় হইতে উদ্ভূত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা আর্থিক কল্যাণের অনুপাত অনুযায়ী হইবে। অর্থাৎ রামকে যদি একশত পরিমাণ সুখস্বচ্ছন্দতা বা আর্থিক কল্যাণ হইতে ১০টি সুখস্বচ্ছন্দতা

২। সমানুপাতিক ত্যাগ নীতি

ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে শ্যামকে ২০০ পরিমাণ সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে ২০টি, যদুকে ৩০০ হইতে ৩০টি এবং রহিমকে ৪০০ হইতে ৪০টি পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে আরও সহজ হয় যদি আমরা মনে করিয়া লই যে, প্রত্যেকের সুখস্বচ্ছন্দতা বা আর্থিক কল্যাণ ঠিক তাহার আর্থিক আয় অনুযায়ী হইয়া থাকে। তাহা হইলে সমত্যাগ নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক করদাতাকে—যতই তাহাদের আয়ের পার্থক্য হউক না কেন—একই পরিমাণ কর দিতে হইবে। অর্থাৎ বার্ষিক ২,০০০্ টাকা যাহার আয় তাহাকে যদি ১০০্ টাকা কর দিতে হয়, ৩,০০০্ টাকা ৪,০০০্ টাকা যাহাদের আয় তাহাদিগকেও সেই একই পরিমাণ অর্থাৎ ১০০্ টাকাই কর দিতে হইবে। সমানুপাতিক নীতি অনুযায়ী করদাতাগণকে তাহাদের প্রত্যেকের আয়ের অনুপাত অনুযায়ী কর দিতে হয়। ২,০০০্ টাকা বার্ষিক যাহার আয় তাহাকে যদি আয়ের কুড়ি ভাগের এক ভাগ হিসাবে ১০০্ একশত টাকা কর দিতে হয়—তাহা হইলে ৩,০০০্ হাজার টাকা যাহার আয় তাহাকে ঐ হিসাবে দিতে হইবে ১৫০্, ৪,০০০্ হাজার টাকা যাহার আয় তাহাকে দিতে হইবে ২০০্ দুইশত টাকা। ন্যূনতম ত্যাগনীতি অনুসারে সকল করদাতার সমষ্টিগত প্রকৃত চাপ যথাসম্ভব স্বল্প হইবে। ইহার বিষয় পূর্বেই বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

৩। ন্যূনতম ত্যাগনীতি

চতুর্থ-নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন করদাতাগণ মধ্যে আয়ের বিভিন্নতার দরুণ যে বৈষম্য রহিয়াছে কর নির্ধারণ দ্বারা উহাকে কমিতে বা বাড়িতে দেওয়া হইবে না, উহাকে অপরিবর্তনীয় রাখিতে হইবে। সামাজিক অসাম্যের মূলে বিদ্যমান বহুবিধ কারণগুলি দূর না করিয়া শুধু কর নির্ধারণ দ্বারা মানুষের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য

৪। অ-হস্তক্ষেপ নীতি

নিরাকরণের ভার কর্তৃপক্ষের নেওয়া সঙ্গত নহে; বরং কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকাই কর্তব্য, ইহাই এই নীতির মূলকথা।

আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্বে কর নির্ধারণের তিনটি প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এবং তাহাদের পরিচয় দেওয়া এখানে আবশ্যক। ইংরাজীতে ইহাদিগকে বলা হয় Proportional Taxation (আনুপাতিক করপ্রণালী), Progressive Taxation (অগ্রগামী বা ক্রমবর্ধমান করপ্রণালী) ও Regressive Taxation (প্রতিগামী বা ক্রমহ্রাসমান করপ্রণালী)।

কর নির্ধারণের তিনটি প্রণালী

আনুপাতিক করপ্রণালী সকল মানুষকে কর বাবদ তাহাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দিতে বাধ্য করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—টাকা প্রতি এক আনা কিংবা আয়ের এক ষোড়শাংশ কর নির্ধারিত হইলে যাহার বার্ষিক আয় দু'-হাজার টাকা তাহাকে কর বাবদ দিতে হইবে ১২৫৲ টাকা। যাহার আয় তিন হাজার টাকা তাহাকেও ঠিক ঐ একই হারে দিতে হইবে ১৮৭।৷০ আনা। আয় বাড়িলেও হার বা নিরিখ একই থাকিবে; শুধু অনুপাতে মোটের উপর বেশী টাকা দিতে হইবে।

১। আনুপাতির কর প্রণালী

অগ্রগামী বা ক্রমবর্ধমান কর-প্রণালী অনুযায়ী যতই মানুষের আয় বেশী হইবে ততই তাহাকে উচ্চতর হারে কর দিতে হইবে। ভারতীয় আয় কর আইন অনুযায়ী ২,০০০৲ টাকা হইতে ৫,০০০৲ টাকা পর্যন্ত যাহাদের বার্ষিক আয় তাহাদিগকে টাকা প্রতি তিন পয়সা হিসাবে আয়কর দিতে হয়; এবং ৫,০০০৲ টাকা হইতে ১০,০০০৲ হাজার টাকা পর্যন্ত যাহাদের বার্ষিক আয় তাহাদিগকে দিতে হয় টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা হারে। এমনি করিয়া যাহার আয় যত বেশী তাহাকে তত অধিক হারে কর দিতে

২। অগ্রগামী কর প্রণালী

হয়। প্রতিগামী বা ক্রমহ্রাসমান প্রণালী অনুসারে ঠিক ইহার বিপরীত নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার আয় যত বেশী তাহাকে তত অল্প হারে কর দিতে হয়। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, ধনী ব্যক্তিকে মোটের উপর টাকা কম দিতে হয়। বরঞ্চ করের হার নিম্নতর হইলেও অধিক আয়ের উপর উহা দিতে হয় বলিয়া মোটের উপর টাকার পরিমাণ বেশীই পড়ে। ৫,০০০৲ হাজার টাকা আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি টাকা প্রতি এক আনা হারে যে পরিমাণ কর দিতে বাধ্য হইবে, ক্রমহ্রাসমান রীতি অনুসারে টাকা প্রতি দুই পয়সা হারে কর দিলেও ২০,০০০৲ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তদপেক্ষা অনেক বেশী টাকা দিতে হইবে।

৩। প্রতিগামী কর প্রণালী

আমরা করধার্যের চারিটী আদর্শ বা নীতি এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার তিনটি রীতি বা প্রণালীর উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কোন্ রীতি অবলম্বন করিতে হইবে এক্ষণে তাহা আলোচনা করিব। করদান ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষকে সমপরিমাণ ত্যাগ করিতে হইবে ইহাই যদি আমাদের আদর্শ হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সমানুপাতিক কর নির্ধারণ রীতি অনুসরণ না করিয়া অগ্রগামী বা ক্রমবর্ধমান রীতির আশ্রয় গ্রহণ করাই বিধেয় অর্থাৎ সকলকে তুল্য ব সমান হারে কর না দিয়া যাহার আয় যত বেশী তাহাকে তত উচ্চহারে কর দিবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইবে। সমত্যাগ নীতি অনুসারে প্রত্যেককে একই হারে কর না দিয়া আয়ের অনুপাতে নিম্নতর বা উচ্চতর হারে কর দিতে হইবে ইহা শুনিলে প্রথমতঃ একটু বিস্ময় বোধ হইতে পারে ; কিন্তু এস্থলে প্রথমেই একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমরা এখানে সমান অর্থ ত্যাগের কথা বলিতেছি না, সমান আর্থিক কল্যাণ বা বৈষয়িক সুখ স্বচ্ছন্দত (economic welfare) ত্যাগের কথাই বলিতেছি। সেইজন্যই উভয়ের

কোন্ আদর্শ অনুসরণে কোন্ রীতি বা প্রণালী অবলম্বনীয়

পক্ষে সমত্যাগ অর্থ একই হারে আর্থিক ত্যাগ নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে এইরূপ পার্থক্য করিবার যুক্তি-সঙ্গত কি কারণ আছে? তাহার উত্তর এই যে, যাহার আয় যত বেশী তাহার বৈষয়িক আরাম বা সুখ স্বচ্ছন্দতা ঠিক সেই পরিমাণে বেশী ইহা সত্য নহে। কারণ আয়ের পরিমাণের একটা সীমা না থাকিলেও ভোগের পরিমাণের একটা সীমা আছে এবং সেই সীমা উত্তীর্ণ হইবার পর (যাহাকে ইংরাজীতে **marginal utility** বা প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়) ভোগের দিক দিয়া অর্থের মূল্য অনেক খানি কমিয়া যায়। সেই জন্যই সমত্যাগনীতি অনুসরণ করিতে হইলে সমানুপাতিক প্রণালী অনুযায়ী একই হারে কর ধার্য না করিয়া অগ্রগামী প্রণালী অনুসারে অধিকতর আয়ের উপর উচ্চতর হারে কর নির্ধারণ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ত্যাগের দিক দিয়া সমতা রক্ষা হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কারণ এইমাত্র আমরা উল্লেখ করিয়াছি, যাহার অর্থ যত অধিক, সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধান ও অভাব মোচনের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন তাহার তত কম। সেইজন্যই সমত্যাগনীতি অনুযায়ী তাহার উচ্চতর হারে অধিকতর কর দেওয়া আবশ্যক। আর যদি আনুপাতিক ত্যাগ নীতিকেই আমরা আদর্শ ধরিয়া লই, তাহা হইলেও ক্রম-বর্ধমান বা অগ্রগামী করপ্রণালীই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু বৃদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষা আবও বেশী করিতে হইবে। কারণ সমানুপাতিক ত্যাগের ইহাই তাৎপর্য যে, যাহার আয় যত অধিক এবং ভোগের পরিমাণ যত বেশী, তাহাকে তদনুপাতে অধিকতর সংখ্যক আরাম বা ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ রামের ভোগের বা আরামের সংখ্যা যদি ১০০ একশত হয় এবং শ্যামের, যদুর ও রহিমের যথাক্রমে ২০০, ৩০০ ও ৪০০ শত হয়, তাহা হইলে সমত্যাগনীতি অনুসারে প্রত্যেককে ১০টি, এবং সমানুপাতিক নীতি অনুসারে প্রত্যেককে যথাক্রমে ১০, ২০, ৩০ ও ৪০টি ভোগ বা আরাম ত্যাগ করিতে হইবে এবং যেহেতু অর্থ যতই বেশী হয় তাহার ভোগমূল্য ততই হ্রাস পায়,

সেই হেতু করনির্ধারণ করিবার বেলায় সমত্যাগনীতি অনুসারেও ক্রমবর্ধমান-রীতিই অনুসরণ করিতে হইবে এবং সমানুপাতিক নীতি অনুসারেও ঐ একই রীতি অবলম্বন করিতে হইবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শুধু বৃদ্ধির হার আরো বাড়াইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ২,০০০৲ হাজার, ৩,০০০৲ হাজার ও ৪,০০০৲ হাজার ট্যকা আয়ের উপর সমত্যাগ নীতি অনুযায়ী যদি যথাক্রমে ৻১০, ৻১৫ ও ৴০ আনা হারে কর ধার্য করা হয় তাহা হইলে সমানুপাতিক ত্যাগ-নীতি অনুসারে যথাক্রমে ৻১০, ৴০ ও ৶০ আনা (আনুমানিক) হারে কর ধার্য হওয়া উচিত।

আর ন্যূনতম ত্যাগ যদি আমাদের কর ধার্যের আদর্শ হয় তাহা হইলে স্বল্প আয় বিশিষ্ট সকল লোককে কর হইতে একেবারে মুক্তি দিয়া ধনীদের উপর খুব উচ্চ হারে কর নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অবশ্য এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে আয়ের একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে হইবে। যেমন ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে ২,০০০৲ টাকার নিম্নে যাহার বার্ষিক আয় তাহাকে আয়কর দিতে হয় না; তদূর্ধে সকলকে ক্রমবর্ধমান রীতি অনুযায়ী আয়কর দিতে হয়।

এক্ষণে চতুর্থ করনির্ধারণ নীতি সম্পর্কে পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। এই নীতির আদর্শ হইতেছে এই যে, কর নির্ধারণ দ্বারা মানুষের আর্থিক অবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া। অর্থাৎ এমনভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর উপর কর নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে ধনীর উপর উচ্চতর হারে কর নির্ধারিত হইয়া এই বৈষম্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতে না পারে কিংবা তাহার উপর করের হার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতে না পারে। বর্তমান সমাজে বিদ্যমান আর্থিক বৈষম্যকে কর নির্ধারণ দ্বারা কোন প্রকারে পরিবর্তিত না করাই এই নীতির আদর্শ। এ আদর্শ রক্ষা করিতে হইলে আমাদের পূর্বোল্লিখিত তিনটি কর-নির্ধারণ

প্রণালীর কোন্‌টি অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই বিবেচ্য। আনুপাতিক করপ্রণালী দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সফল হইবে, কেহ কেহ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। কারণ এইরূপ করনির্ধারণের মূল সূত্রটী এই যে, সকল অবস্থার করদাতাকেই তাহার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ কর বাবদ দিতে হয়। অবস্থার তারতম্যের জন্য এই নির্দিষ্ট অংশ বা অনুপাতের কোনরূপ পরিবর্তন করা হয় না; সুতরাং বিভিন্ন লোকের মধ্যে অবস্থার যে বৈষম্য ছিল তাহা স্থিরই থাকিয়া যায়—তাহার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু এই মত আর একদল সমর্থন করেন না; তাঁহারা বলেন, আয়ের বৈষম্য যথার্থ ঠিক রাখিতে হইলে অগ্রগামী বা ক্রমবর্ধমান কর নির্ধারণ রীতিই অনুসরণীয়। কারণ বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা যদি ভোগের দিক দিয়া—অর্থের দিক দিয়া নহে—স্থির রাখিতে হয় তাহা হইলে যাহার যত বেশী আয় তাহার উপর তত উচ্চহারে কর নির্ধারণ করা প্রয়োজন, অন্যথা বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে। আনুপাতিক কর-নির্ধারণ নীতি অনুসরণ করিলে ভোগের দিক দিয়া মানুষের বৈষম্য স্থির থাকিবে না। কেন, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি। ১,০০০৲ টাকা আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট টাকায় ᠵ আনা হারে কর বাবদ দেয় ১২৫৲ টাকার যে মূল্য, ৫,০০০৲ টাকা আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট ঐ একই হারে ধার্য ৬২৫৲ টাকার ততখানি মূল্য নহে। যদিও ৬২৫৲ টাকা কর দিবার পরেও শেষোক্ত ব্যক্তির আয় প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা টাকার পরিমাপে ঠিক পূর্ববৎ পাঁচ গুণই বেশী থাকিবে, তথাপি ট্যাক্স দিবার পূর্বে ১,০০০৲ টাকা ও ৫,০০০৲ টাকা মধ্যে ভোগের দিক দিয়া যে পরিমাণ বৈষম্য ছিল ট্যাক্স দিবার পর ঐ বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ১২৫৲ টাকা আয় হ্রাসের জন্য হয়ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিসের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে; শেষোক্ত ব্যক্তি (৬২৫৲ টাকা আয় হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও) তিন হাজার টাকায় তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া ব্যাঙ্কে সম্ভবতঃ এখনও

১,৩৭৫৲ টাকা সঞ্চয় করিতেছে। সেইজন্যই এক শ্রেণীর পণ্ডিত বৈষম্য রক্ষার জন্য আনুপাতিক করনির্ধারণ রীতি অপেক্ষা, ক্রমবর্ধমান রীতির প্রয়োগ অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী মনে করেন।

আমাদের আলোচনাকে এখন গুটাইয়া আনা যাক্। কর নির্ধারণের ন্যায়সঙ্গত নিয়ম অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা তিনটি নীতির কথা প্রথমে উল্লেখ করি: Cost theory, Benefit or Service theory and Ability to pay theory. প্রথমোক্ত নীতি দুইটি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নহে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হয় এবং আমরা শেষোক্ত নীতির আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু কর দিবার ক্ষমতার পরিমাপ কি ভাবে করা যাইবে, কাহাকে কতখানি ত্যাগের কথা বলা হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আমরা সমত্যাগনীতি, সমানুপাতিক ত্যাগনীতি, ন্যূনতম ত্যাগনীতি, অ-হস্তক্ষেপ নীতি নামক চারিটী সূত্রের নাতিদীর্ঘ আলোচনা করি। এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, চারিটী সূত্রের যে সূত্রই আমরা গ্রহণ করি না কেন, অগ্রগামী বা ক্রমবর্ধমান করনির্ধারণ প্রণালীই একমাত্র আদর্শ প্রণালী, তফাৎ কেবল ধনের অনুপাতে করের হার বাড়াইবার ক্ষিপ্রতা ও উগ্রতার মধ্যে। অর্থাৎ আমরা যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ প্রণোদিত হইয়া করধার্য ব্যাপারে অগ্রসর হই না কেন, অগ্রগামী বা ক্রমবর্ধমান কর প্রণালীই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে, নীতি বিশেষে বৃদ্ধির হার কম কিংবা বেশী, ধীর কিংবা দ্রুত।

আলোচনার সার সিদ্ধান্ত

অবশ্যই সিদ্ধান্তের গোড়ায় আমরা কয়েকটা জিনিসকে মানিয়া লইয়াছি। তন্মধ্যে একটি হইতেছে এই যে, কর দিবার সময় ত্যাগের বিচার অর্থের পরিমাণ দ্বারা হইবে না, কাহাকে কতখানি ভোগ বা আরাম ত্যাগ করিতে হইতেছে তাহা দ্বারা হইবে। কারণ একটা সীমার বাহিরে ভোগ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন

সিদ্ধান্তের মূলভিত্তি

হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সেইজন্যই ধনীর উচ্চতর হারে কর দেওয়া কম কষ্টকর। ধনী ব্যক্তি উচ্চতর হারে কর দিয়াও তাহার আরাম ও সুখস্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিবে, তাহা অপেক্ষা কম ধনী নিম্ন হারে কর দিয়াও আরাম ও সুখস্বচ্ছন্দতার দিক দিয়া হয়ত বেশী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আর একটি জিনিস যাহা আমরা পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি তাহা হইতেছে সম-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও আর্থিক কল্যাণ সম-পরিমাণ হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, একজন অবিবাহিত ব্যক্তির নিকট ২,০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের যে মূল্য, বৃহৎ পরিবার বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট ঐ ২,০০০৲ টাকা আয়ের মূল্য অনেক বেশী। সমত্যাগনীতি অনুসরণ করিয়া কর ধার্য করিতে হইলে উভয়ের মধ্যে করের তারতম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে এরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক হার নির্ধারণ করা কার্যতঃ অসম্ভব। সেইজন্যই বিভিন্ন আর্থিক অবস্থার মধ্যে মোটামুটি পার্থক্য বিচার করিয়া কর ধার্য করা ভিন্ন উপায় নাই।

এ্যাডাম স্মিথ ও তাঁহার পরবর্তী রক্ষণশীল দলের কোন কোন পণ্ডিত আজ পর্যন্তও আনুপাতিক কর নির্ধারণ রীতির প্রতি তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। অর্থের ক্রমহ্রাসমান মূল্যের (Law of Diminishing Utilityর) সহিত পরিচয়ের অভাবই তাঁহাদের এই মনোভাবের কারণ। দেড়শত বৎসর পূর্বে এ্যাডাম স্মিথের সময়ে অর্থ শাস্ত্রের এই সূত্রটির আবিষ্কার হয় নাই। আর সে সময়ে মানুষের সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ভোগের প্রাচুর্য এতটা প্রসার বা পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। সর্বশেষে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কোন্‌টা ন্যায় এবং কোন্‌টা অন্যায় তাহার

এ্যাডাম স্মিথ দলের প্রাচীন সংস্কার

বিচার মোটেই সুসাধ্য নহে। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে মতভেদই যে শুধু ইহার কারণ তাহা নহে, করের সমষ্টিগত ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য ও জ্ঞানের অভাবই ইহার অন্যতম কারণ। অধিকন্তু যুগে যুগে, বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে, সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ও মতামতের গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতেছে। ধনী নির্ধনের যে বৈষম্য এক সময়ে মানুষ সমাজের স্বাভাবিক অবস্থারূপে নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইয়াছিল আজ সে সম্বন্ধে সে অতিশয় চেতন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ন্যায় ও অন্যায়ের দিক দিয়া করনির্ধারণ নীতির আদর্শ ঠিক করিতে হইলে অনেক ক্ষেত্রে মতের অনৈক্য ঘটিবে ইহা স্বাভাবিক। সেই জন্যই ন্যায়ের দিক দিয়া কর নির্ধারণের আদর্শনীতি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া দেশের আর্থিক মঙ্গলের দিক দিয়া ইহার বিচার করাই সঙ্গত এবং অধিকতর সহজসাধ্য, এইরূপ মত কেহ কেহ পোষণ করেন।

ন্যায় অন্যায় বিচারে বিঘ্ন

দেশের আর্থিক মঙ্গল ও তাহার তাৎপর্য

অবশ্য ইহার মধ্যেও তর্কের ও সন্দেহের স্থান রহিয়াছে। বর্তমান যুগে সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যখন প্রবল বিদ্রোহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং সাম্যবাদের বাণী আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিয়াছে, তখন এই প্রশ্নও মানুষের মনে স্বতঃই উদিত হইবে যে, দেশের সমষ্টিগত আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ কি আমরা শুধু গুটিকয়েক মানুষের হাতে সঞ্চিত অপরিমিত অর্থের দ্বারাই করিব, না, বহুজনের মধ্যে ছড়ান পরিমিত অর্থের দ্বারা করিব? একদেশে বহুলোকের ঘোরতর দারিদ্র্য ও তাহারই মধ্যে কতিপয় লোকের হাতে প্রচুর ধনসমৃদ্ধি, পক্ষান্তরে অন্যদেশে সর্ব-সাধারণের মধ্যে একটা মাঝারি রকমের আর্থিক স্বচ্ছলতা; এই দুই অবস্থার তুলনা করিয়া আমরা যদি দেখিতে পাই যে, সমষ্টিগত ঐশ্বর্যের পরিমাণ শেষোক্ত দেশ অপেক্ষা প্রথমোক্ত দেশে অধিক, তাহা হইলে কি আমরা প্রথমোক্ত দেশের অবস্থাকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া বর্তমান যুগে মনে করিব?

মনুষ্য সমাজের আর্থিক বৈষম্য করনির্ধারণ দ্বারা দূর করিতে যাহারা অতি আগ্রহশীল তাহাদের বিরুদ্ধে একদল লোক এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও ব্যবসা প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন হইতে যদি আমরা বৈষম্য দূর করিতে না পারি, তাহা হইলে কেবল কর নির্ধারণের বেলাই বৈষম্যের দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর উপর অতিরিক্ত জুলুম করিবার সার্থকতা কি? বর্ত্তমান যুগে এ আপত্তি অবশ্য টিকিবে না, কারণ চারিদিকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অসঙ্গতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া উহা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। যাহা হউক, কর নির্ধারণ ব্যাপারে অধিকতম মানবের প্রভূততম কল্যাণ সাধনকেই আমরা সংক্ষেপে আমাদের লক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি। ইহা শুধু করনির্ধারণ নীতিরই লক্ষ্য নহে, যে রাষ্ট্রীয় বিধানের মধ্যে কর একটা অংশমাত্র, সেই বৃহত্তর শাস্ত্রেরও ইহাই আদর্শ।

শেষ সিদ্ধান্ত

ধনোৎপাদনের উপর করের প্রভাব

রাষ্ট্রকে কর আদায়ের অধিকার তাহার নিজের কোন বিশেষ উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত দেওয়া হয় নাই ; দেশের সর্বাঙ্গীন হিতসাধনের জন্তই তাহার হাতে এই অস্ত্র দেওয়া হইয়াছে, ইহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ধনোৎপাদনশক্তির উন্নতি বিধান দেশহিত সাধনেরই অন্ততম উপায় মাত্র। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রত্যেক করের ভাল মন্দ একটা ফলাফল রহিয়াছে এবং ইহা আত্মপ্রকাশ করে দেশের ধনোৎপাদন, ধনবণ্টন ও অন্তান্ত অর্থনৈতিক ধারার ভিতর দিয়া। দেশের ধনোৎপাদনের উপর করের এই ফলাফল বিচার করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত।

ধনোৎপাদনের উপর করের ত্রিবিধ প্রভাব

অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ এই প্রভাবের বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা (১) মানুষের কাজকর্ম করিবার ও (ধন) সঞ্চয় করিবার ক্ষমতার উপর করের প্রভাব ; (২) মানুষের কর্ম করিবার ও সঞ্চয় করিবার আকাজ্ক্ষা বা প্রবৃত্তির উপর করের প্রভাব ; (৩) মূলধন বিনিয়োগের উপর করের প্রভাব। আমরা জানি দেশের সমৃদ্ধি প্রধানতঃ নির্ভর করে কৃষিশিল্পজাত পণ্যোৎপাদন ও তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের উপর। ইহা আবার নির্ভর করে মানুষের কর্মাকাজ্ক্ষা ও কর্মক্ষমতার উপর। কেবলমাত্র কর্মাকাজ্ক্ষা ও কর্মক্ষমতার দ্বারাও ধনোৎপাদন সম্ভব নহে। ইহার সঙ্গে প্রয়োজন মূলধনের, এবং এই মূলধন আসে মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও সঞ্চয় ক্ষমতা হইতে। দাস প্রথার তিরোধানে আধুনিক সভ্যসমাজে মানুষ কর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন হইলেও, সামাজিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় আইনকানুন বহু পরিমাণে এই স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রভাবান্বিত, এমন কি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। একান্নবর্তী পরিবার, উত্তরাধিকার বিধি, ডিক্‌টেটারের হুকুম ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি

করিতে পারিব। তথাপি কর্ম সম্বন্ধে মানুষের যতটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রহিয়াছে, সঞ্চয় সম্বন্ধে আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থানুযায়ী তাহার সে পরিমাণ স্বাধীনতা নাই, কারণ সঞ্চয়ের বেলা অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় আইন কানুন ও সঙ্ঘ-মনোবৃত্তি কাজ করিয়া থাকে। সমবায় সমিতি কিংবা যৌথ-কারবারের সঞ্চিত তহবিলের সৃষ্টি ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় হয় না; বাধ্যতা-মূলক জীবনবীমা কিংবা সংস্থান তহবিল (Provident Fund) এর সৃষ্টিও ব্যষ্টির ইচ্ছাধীন নহে।

মানুষের কর্ম-ক্ষমতার উপর করের প্রভাব সম্বন্ধে এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা যাক। করের সাহায্যে যখন সহজেই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও মানুষের আয়হ্রাস ঘটান যাইতে পারে, তখন সমাজের দরিদ্র অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগ্যতার উপর ইহার প্রভাব কতটা গুরুতর তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আধুনিক কালে যে সব দেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বিখ্যাত সেই সব দেশেও এমন লোকের অভাব নাই যাহাদের আয় মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর গৃহ, সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন জীবন যাহাদের নিকট নিতান্ত কল্পনার সামগ্রী। তাহাদের এই সামান্য জীবনপাথেয় হইতে কর মারফতে যদি আরও কিছু কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের কর্মশক্তি বা যোগ্যতা রক্ষা পাইবে কি প্রকারে? তাহাদের বংশধরগণই বা মানুষ হইবে কি উপায়ে? সেই জন্যই আয়-কর ও পণ্যশুল্ক নির্ধারণের সময় ইহাদের কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং এই সব করের চাপ যাহাতে ইহাদের উপর অত্যধিক হইয়া না পড়ে তৎসম্পর্কে বিশেষ হুঁসিয়ার হইতে হইবে।

মানুষের কর্ম-ক্ষমতার উপর করের প্রভাব

একদিকে দরিদ্রের পক্ষে অপরিহার্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর কর-নির্ধারণ যেমন সঙ্গত নহে, অন্যদিকে যে সব জিনিস সাধারণের

পক্ষে হিতকর, যোগ্যতাবর্ধক, সেই সব জিনিসের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি করাও সঙ্গত নহে। স্নুতরাং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভোগসামগ্রীর উপর শুল্ক নির্ধারণ করিবার সময় আমাদিগকে এমন কতকগুলি জিনিস বাছিয়া লইতে হইবে যাহার সহিত মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যবিধ উন্নতির সংস্রব ঘনিষ্ঠ নহে কিংবা যে সব জিনিসের প্রয়োজন অভ্যাসবশতঃ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হিতকর নহে। এই হিসাবে মাদক দ্রব্যের উপর কর নির্ধারণ দরিদ্রের পক্ষে অপ্রিয় হইলেও অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই ভাবে কাজ করিবার পক্ষে অসুবিধা এই যে, এই প্রকার কর হইতে অধিক অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই অনেক সময়ে কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত সঙ্গত নীতি লঙ্ঘন করিতে প্রলুব্ধ হন।

পণ্য শুল্ক নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়

আয়-কর সম্বন্ধে প্রধান সমস্যা, দরিদ্রকে ইহার চাপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে কর নির্ধারণযোগ্য ন্যূনতম আয়ের সীমারেখা কোথায় নির্দেশ করা যাইবে। আমাদের দেশে বহুকাল বার্ষিক ২,০০০৲ টাকার অনধিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আয়-করের হাত হইতে অব্যাহতি দিয়া আসা হইয়াছে। বর্তমান সময়েও এই নিয়মই প্রচলিত আছে। কিন্তু মাঝে কয়েক বৎসর ক্রমান্বয়ে রাজস্ব তহবিলে ঘাটতি হইতে থাকিলে কর্তৃপক্ষ ন্যূনকল্পে বার্ষিক ১,০০০৲ টাকা আয়ের উপরও কর নির্ধারণ করিয়াছিলেন। স্নুতরাং এই সম্পর্কে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা সুকঠিন। কেহ কেহ আবার এইরূপ মতও পোষণ করিয়া থাকেন যে, ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক ও শিল্পী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সীমা নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সকল কাজ সমান শ্রম ও কষ্টসাধ্য নহে। তবে মোটের উপর আমরা এই প্রশস্ত নীতি স্বীকার করিয়া লইতে পারি

আয়-করের নিম্ন সীমা নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়

যে, সাধারণ জীবন-ধারণের উপযোগী আয়ের অনেকটা উর্ধে করের নিম্ন সীমা নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানুষের সঞ্চয়-ক্ষমতার উপর করের প্রভাব চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই সহজ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হইবে যে, কর মাত্রই উদ্বৃত্ত আয়ের হ্রাস সাধন করিয়া সঞ্চয়কে খর্ব করিবে; সুতরাং যাহাদের কোন প্রকার উদ্বৃত্ত আয় নাই এইরূপ দরিদ্র ব্যক্তির উপর করভার চাপিলে সঞ্চয়ের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে না; কারণ পূর্বেই যাহার সঞ্চয় ছিল না এখন তাহার সে বালাই আরও থাকিবে না। অবশ্য এইজন্য এই প্রকার করের সমর্থন কোনরূপেই করা যাইতে পারে না। কারণ ইহা দরিদ্রকে আরও পীড়িত করিবে এবং তাহার ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকেও অধিকতর দূরে ঠেলিয়া দিবে। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, ধনীর উপর উচ্চহারে কর নির্ধারণ করিলে দেশের অর্থ-সঞ্চয় হ্রাস পাইবে সত্য, কিন্তু দরিদ্রের উপর কর ধার্য করিয়া দেশের সঞ্চয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার নীতি অপেক্ষা ধনীর উপর কর নির্ধারণ অধিকতর সমর্থন যোগ্য।

মানুষের সঞ্চয়-ক্ষমতার উপর করের প্রভাব

এই সম্পর্কে আমাদের আরও একটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। সঞ্চয় মাত্রই মূলধন নহে এবং দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তায় নিয়োজিত হয় না। সঞ্চয় তখনই দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় যখন তাহা ধনোৎপাদনের জন্য মূলধনরূপে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক মতে ব্যয় মাত্রই অনভিপ্রেত নহে; কারণ অর্থের দ্রুত হস্তান্তরের উপর কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও তৎসহ মানুষের আর্থিক উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। ব্যাপক-ভাবে বলিতে গেলে ধনোৎপাদনের জন্য সঞ্চিত অর্থই একমাত্র মূলধন নহে—মানুষের শক্তি ও যোগ্যতাকেও আমরা মূলধনরূপে গণ্য করিতে পারি।

ধনীর উপর কর নির্ধারণ কেন অধিকতর সমর্থন যোগ্য

সেইজন্যই রাষ্ট্রপতিগণ যদি একদিকে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহাদের সঞ্চয়ের হ্রাস সাধন করেন এবং অন্যদিকে ঐ অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া দরিদ্র সাধারণের শক্তি ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়তা করেন, তাহা হইলে দেশের ধনোৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর উন্নতিলাভ করিতে পারে।

কর্ম-প্রবৃত্তি ও সঞ্চয়-প্রবৃত্তির উপর করের প্রভাব

এক্ষণে মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তি (desire to work) ও সঞ্চয়-প্রবৃত্তি (desire to save)র উপর করের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। কর্ম-ক্ষমতা ও সঞ্চয়-ক্ষমতার উপর করের প্রভাব বিচার করা যতটা সহজ, এই বিচার ততটা সহজ নহে। কারণ প্রথমোক্ত বিচার অনেকটা বস্তুগত। মানুষের অভাব থাকিলে তাহার কর্ম-ক্ষমতা বা যোগ্যতা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাকে অভাবমুক্ত রাখিতে পারিলে তাহার ক্ষমতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং মানুষের কর্ম ও সঞ্চয়-ক্ষমতার উপর করের প্রভাব বিচার করিবার সময় আমাদিগকে কোথায় কি-ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা আমরা অনেকটা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু কোন্ কর্ম মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তির উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে তাহা প্রত্যেক মানুষের মনোগত। সুতরাং তাহার বিচার মনস্তত্ত্বের অধীন এবং চিত্তাকর্ষক হইলেও সহজ নহে। প্রথম কথা, সকল মানুষের মনোবৃত্তি একপ্রকার নহে। একই কাজের মানসিক প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং আমরা যদি প্রশ্ন করি, উচ্চ হারে কর ধার্য করিলে মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তি হ্রাস পাইবে কিনা, তাহা হইলে ইহার সর্ববাদিসম্মত উত্তর পাওয়া সম্ভব হইবে না। এরূপ ব্যাপক প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত

একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর মনের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতে পারি। যদি কোন ভদ্রলোকের প্রতি মাসে একটি করিয়া ঝরণা কলম খোয়া যায় তাহা হইলে তিনি কি করেন? তিনি কি চোরের উপর রাগ করিয়া কলম কেনা বন্ধ করিয়া দেন, না, যথারীতি নূতন কলম দ্বারা অপহৃত কলমের স্থান পূরণ করিতে থাকেন? ইহার যথাযথ উত্তর নির্ভর করিবে তিনটি অবস্থার উপর :—(১) ভদ্রলোকের কয়টি কলম? (২) তাঁহার অবস্থা কতটা সচ্ছল? (৩) তিনি কি কৃপণ, না, মুক্তহস্ত? এই সম্পর্কে আমাদের একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। এক ব্যক্তির গামছা হারাইলে তিনি দাড়ি রাখিতে সুরু করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য,—নাপিতের পয়সা বাঁচাইয়া তিনি গামছার মূল্য উদ্ধার করিবেন। আমরা অনেকেই তাহার এই কার্য সমর্থন না করিলেও, ইহাও ঘটা সম্ভব এবং আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর এই গল্পের মধ্যেই অনেকটা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থার ও চরিত্রের লোকের উপর করের ফলাফল বিভিন্ন প্রকার হইবে।

বিভিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের উপর বিভিন্ন রূপ প্রভাব

মোটামুটি সিদ্ধান্ত

তবে মোটের উপর ইহা সম্ভবতঃ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, উচ্চ হারে কর ধার্য করিয়া মানুষের আয়ের হ্রাস সাধন করিলে তাহার কর্ম- ও সঞ্চয়-প্রবৃত্তিও সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। কারণ ধনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের অসীম হইলেও ধনোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা অসীম নহে, বরং অবস্থাধীন।

তদ্বিপরীত মত

অবশ্য ইহার বিপরীত মতও কেহ কেহ পোষণ করিয়া থাকেন এবং মনে করেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা যে অতিরিক্ত উপার্জন হইবে তাহার সমস্তটাই যদি অতিরিক্ত করের সাহায্যে কাড়িয়া লওয়া না হয়, অন্ততঃ তাহার 'খানিকটা' তাহাকে ভোগ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উচ্চ হারে কর নির্ধারণ করিলেও মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না। ইহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলেও আমরা এমন কতকগুলি মানুষ ও অবস্থা কল্পনা করিতে পারি যাহাদের

কর্ম-প্রবৃত্তির উপর করের প্রভাব অতি সামান্য। সচ্ছল অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করিতে যাহারা অভ্যস্ত কিংবা যাহাদের অনেক পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয়, কিংবা ভবিষ্যতের জন্য যাহাদিগকে একটা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেই হইবে—ইহাদের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির উপর অতি উচ্চ হারে কর নির্ধারিত হইলেও, ইহাদিগকে কর্মের মাত্রা হ্রাস না করিয়া বরঞ্চ বাড়াইয়া দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করিতে যাহারা অতিশয় ভালবাসেন, পদ ও ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চাভিলাষের যাহাদের সীমা নাই তাহাদের কর্ম- ও সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে উচ্চ কর দ্বারা সাধারণতঃ ক্ষুণ্ণ করা যায় না। বরঞ্চ এইরূপ প্রতিকূলতা ইহাদিগকে অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করিয়া থাকে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যবসা-চক্রের আবর্তনে মন্দা উপস্থিত হইলে কর-ভার মানুষকে যতটা দমাইয়া দিতে সক্ষম হয় সুসময়ে ততটা হয় না। এবং দুর্বল, অকর্মণ্য পুরুষ কর-ভার দ্বারা যেরূপ সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ পুরুষ কখনও সেরূপ পড়ে না।

আমরা বিভিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের উপর করের প্রভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে বিভিন্ন প্রকার করের প্রতিক্রিয়া মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তির উপর কিরূপ হইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। নিজের শ্রমোপার্জিত ধনের উপর কেহ ভাগ বসাইলে আমাদের মানসিক অবস্থা যতটা বিরূপ হওয়া সম্ভব, অপ্রত্যাশিত বা অনুপার্জিত ধনের উপর ভাগ বসাইলে নিশ্চয়ই ততটা হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্যই যুদ্ধ বিগ্রহাদি আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে অগ্নিমূল্যে পণ্যবিক্রয় করিয়া যখন অনেকে ক্রোড়পতি হইয়া বসেন, তখন তাঁহাদের উপর অতি উচ্চ হারে কর নির্ধারণ করিলেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ

মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তির উপর বিভিন্ন প্রকার করের বিভিন্নরূপ প্রভাব

করিবার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। দূর উত্তরাধিকার-সূত্রে কিংবা অন্যভাবে যাঁহারা অপ্রত্যাশিত সম্পদের অধিকারী হন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। সাধারণ অবস্থায় এই প্রকার কর হইতে বেশী টাকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে; তবে বিগত ইউরোপীয় সমরের পরে এইরূপ পড়ে-পাওয়া আকস্মিক ধনের উপর উচ্চ কর ধার্য করিয়া অনেক দেশই প্রভূত রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যাহারা কোন প্রকার একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক, তাহাদের উপর উচ্চকর ধার্য করিলে তাহাদের বিশেষ যাইবে আসিবে না; সুতরাং তাহাদের ব্যবসা-প্রবৃত্তির উপর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না।

আমরা যদি স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি করের দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, পণ্যের উপর নির্ধারিত কর (শুল্ক) অপেক্ষা আয় ও সঞ্চয়ের উপর নির্ধারিত কর মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে অধিকতর খর্ব করে। কারণ পণ্যের উপর নির্ধারিত করের চাপ সাধারণতঃ গৌণ এবং অনেক ক্ষেত্রে পণ্য বর্জন দ্বারা পরিহারযোগ্য। এখানে আয়-করের সহিত সঞ্চয়-করের পার্থক্যটুকু আমাদের বোঝা আবশ্যক। আয় মাত্রই মানুষ সঞ্চয় করিতে পারে না, যদিও সঞ্চয় আয় হইতে উৎপন্ন এবং তাহারই একটা অংশ। আধুনিক উন্নত সমাজে মানুষের এই সঞ্চয় সংসাধিত হয় বৃহৎ যৌথ-কারবারের লভ্যাংশের দ্বারা। যে লভ্যাংশ অংশীদারগণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহা তাহাদের আয় এবং ইহার উপর তাহাদিগকে কর দিতে হয়। আর যে লভ্যাংশ কারবারের রিজার্ভ তহবিলে জমা হয়, তাহাই হইল সঞ্চয়। এই সঞ্চিত তহবিল দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিয়া তাহার কৃষি-শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। সুতরাং সঞ্চয়ের উপর কর নির্ধারণ করা আরু

আয়-কর ও সঞ্চয়-করের প্রভেদ

মূলধনের উপর কর নির্ধারণ করা প্রকারান্তরে একই কথা। সেইজন্য আয়-কর নির্ধারণের সময় সঞ্চয়কে তাহা হইতে বাদ দেওয়া যায় কি-না, তদ্বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথম ও প্রধান আপত্তি এই যে, সঞ্চয়কে কর হইতে অব্যাহতি দিলে মানুষের মধ্যে যে ধনবৈষম্য রহিয়াছে, তাহা বিদূরিত না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ যাহারা ধনবান তাহারাই সাধারণতঃ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অথচ এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে তাহারাই মূলধন সৃষ্টির অজুহাতে করের হাত হইতে রেহাই পাইবে। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, মানুষের আয়ের বিবরণ তাহার ব্যবসার খাতাপত্র কিংবা বেতনের হিসাব পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা সম্ভব হইলেও কোন্ মানুষ তাহার আয়ের কতটা ব্যয় ও কতটা সঞ্চয় করিতেছে তাহা জানা যাইবে কি প্রকারে? যাহা হউক, এই সব আপত্তি সত্ত্বেও কতকগুলি সরকারী খতের আয়ের উপর আমাদিগকে কোনরূপ আয়কর দিতে হয় না। যেমন, ইনকাম-ট্যাক্স-ফ্রি গবর্ণমেণ্ট পেপার; কিন্তু ইংলণ্ডের যৌথ-কারবারের রিজার্ভ ফণ্ড বা অবিতরিত লভ্যাংশের উপর (যাহাকে আমরা সঞ্চয় বলিয়া গণ্য করি) আয়-কর দিতে হয়—যদিও ব্যক্তিবিশেষকে এইরূপ সঞ্চিত তহবিলের জন্য কোনরূপ কর দিতে হয় না। সেইজন্য অনেকে একত্র হইয়া একজনের বেনামীতে কারবার পরিচালনা করিয়া কর্তৃপক্ষকে আয়-কর ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে পারেন। বর্তমান সময়ে কোন প্রকার সঞ্চয়কেই আয়-করের হাত হইতে রেহাই না দিবার পক্ষেই মতের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে।

ধনোৎপাদনের যথাসম্ভব স্বল্প বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কর নির্ধারণ করিতে হইলে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের উপর কর ধার্য করাই অন্যতম প্রশস্ত উপায়। আয়-করের সহিত ইহার তুলনা করিলে সুবিধার ভাগ ইহার দিকেই বেশী দেখা যাইবে। প্রথমতঃ আয়-কর স্বোপার্জিতঅর্থ হইতে বার্ষিক

দেয়; কিন্তু উত্তরাধিকার-কর মৃত্যুর পর একবার মাত্র দিতে হয়। সুতরাং মানুষের কর্ম- ও সঞ্চয়-প্রবৃত্তির উপর প্রথমোক্ত করের প্রতিকূল প্রভাব যতটা গুরুতর, শেষোক্ত ক্ষেত্রে ততটা গুরুতর নহে। অবশ্য উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধে একটি কথা এই বলা হইয়া থাকে যে, উহা মূলধনের উপর কর। কারণ পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরলোকগত ব্যক্তির সঞ্চিত মূলধন ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ইহা আংশিকভাবে বিক্রয় করিয়াই এই কর দিতে হয়। ইহার সহজ উত্তর এই যে, আধুনিক কালে উত্তরাধিকার কর দিবার জন্য অর্থের সংস্থান বীমার সাহায্যে পূর্ব হইতেই করিয়া রাখা হয়; সুতরাং সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই কর দিবার প্রয়োজন হয় না। বীমার ফিস্ বাবদ যে অর্থ বীমা-কোম্পানীকে দেওয়া হয়, তাহাও মূলধনরূপেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ শুধু জন্ম-অধিকারে অপরের বিপুল বা প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস ও অর্থোপার্জনের প্রবৃত্তি মানুষের হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং এইরূপ সম্পত্তির উপর যতই উচ্চ হারে কর-নির্ধারণ করা যাইবে ততই ভাবী ওয়ারিশগণের শ্রম ও কর্মবিমুখতা ঘুচিবে এবং করের অর্থ সংগ্রহের জন্য অধিক বীমা ও তাহার জন্য অধিক উপার্জনের প্রয়োজন হইবে। তৃতীয়তঃ উত্তরাধিকার কর দিতে না হইলেই যে তাহা সঞ্চিত হইয়া মূলধনরূপে কার্যে লাগিবে তাহার নিশ্চয়তা কি আছে?

আয় কর অপেক্ষা উত্তরাধিকার করই অধিকতর প্রশস্ত কেন?

সুবিখ্যাত ইটালীয় অর্থ-নীতিবিদ্ অধ্যাপক রিগনান উত্তরাধিকার-কর সম্বন্ধে তাঁহার একটি নিজস্ব পরিকল্পনা দিয়াছেন। উত্তরাধিকার-কর সম্পত্তির মূল্য বা আয়তন অনুযায়ী কম বেশি হইয়া থাকে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। রিগনান প্রস্তাব করিয়াছেন, সম্পত্তির মূল্যানুযায়ী করের হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া তাহার

অধ্যাপক রিগনানের উত্তরাধিকার কর সম্বন্ধে পরিকল্পনা

বয়সানুযায়ী করিতে হইবে। অর্থাৎ উত্তরাধিকারী যতই দূরসম্পর্কীয় হইবেন ততই করের হার বৃদ্ধি পাইবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পুত্রের জন্য বিষয় সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের যতটা প্রবল, পৌত্রের জন্য তদপেক্ষা অনেকটা কম, প্র-পৌত্রের জন্য আরও কম। সুতরাং মানুষের ধনোৎপাদনের ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস না করিয়া যদি যথেষ্ট কর সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রণালীর কার্যকারিতা সহজেই বোধগম্য হইবে। ইহার আর একটা সুবিধা এই যে, যে সব ধনীর দুলাল পিতামহ, প্র-পিতামহের সম্পত্তির দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নানা ব্যসনে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের মোহ-নিদ্রার নিশ্চয়ই অনেকটা ব্যাঘাত ঘটিবে। একই ব্যক্তি যদি পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগমন করে, তাহা হইলে তাহার ওয়ারিশকে মৃতের স্বোপার্জিত সম্পত্তির জন্য যে হারে কর দিতে হইবে, তদপেক্ষা অনেক বেশি দিতে হইবে পৈতৃক সম্পত্তির উপর। অধ্যাপক রিগনান-প্রস্তাবিত এই নীতি ধনোৎপাদনের প্রতিকূল ত নহেই, বরং অনুকূল। কিন্তু ইহাকে কার্যে পরিণত করার পক্ষে কতকগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রতিবন্ধকতা এই যে, উচ্চতর করের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিয়া তাহার মূল্য দ্বারা যদি নূতন সম্পত্তি কোন ব্যক্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে স্বোপার্জিত সম্পত্তির সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ হইবে না।

এই সম্পর্কে অধ্যাপক ডেলটনের অপর প্রস্তাব

অধ্যাপক ডেলটন এই সম্পর্কে আর একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার প্রস্তাবানুযায়ী কাহারও মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত বিষয়ের একটা অংশ মাত্র উত্তরাধিকারীর জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট বিষয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন এবং তাহার বিনিময়ে পোনের

কিংবা বিশ বৎসর কাল অথবা উত্তরাধিকারীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাকে একটি বার্ষিক বৃত্তি দিয়া যাইবেন। এই বার্ষিক বৃত্তির মূল্য বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয়ের সমতুল্য হইবে। এই প্রস্তাবের সুবিধা এই যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। তাহার উত্তরাধিকারীর পক্ষেও নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং এই ব্যবস্থায় অলস, পরবিত্তভোগীর প্রশ্রয় পাইবার উপায় যথাসম্ভব রাখা হয় নাই।

আয়-কর অপেক্ষা উত্তরাধিকার-কর দেশের ধনোৎপাদনের পক্ষে কম হানিকর ইহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি এবং উত্তরাধিকার-করের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আয়-করের ফলাফল সম্বন্ধে আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। মানুষের যেমন শ্রম ও কর্ম দ্বারা সাধারণতঃ অর্থোপার্জন করিতে হয়, তেমনই আবার বিনাশ্রমে বিষয়-সম্পত্তি হইতে আর এক শ্রেণীর বহু অর্থ আয় হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতেছে, ধনোৎপাদনের দিক দিয়া শ্রমোপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের উপর একই হারে কর নির্ধারিত হওয়া উচিত কিনা? ইহার উত্তরে এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, সম্পত্তি হইতে অনায়াস-লব্ধ আয়ের উপর কর মানুষের কর্ম-প্রবৃত্তিকে যতটা ক্ষুণ্ণ করিবে তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষুণ্ণ করিবে শ্রমোপার্জিত আয়ের উপর নির্ধারিত কর। পক্ষান্তরে শ্রম দ্বারা যাহাদিগকে অর্থোপার্জন করিতে হয়, তাহাদের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি নিষ্ক্রিয় বিত্ত-ভোগীদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং শ্রমোপার্জিত আয়ের উপর অপেক্ষাকৃত কম হারে কর-নির্ধারণ করিলে কর্ম-প্রবৃত্তিও ক্ষুণ্ণ হইবে না, সঞ্চয়-প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার দরুণ কার্যক্ষেত্রে উহার প্রচলন কোথাও হয় নাই।

উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের উপর একই হারে কর ধার্য সঙ্গত কিনা

অধ্যাপক ডেলটনের মতে আয়ের স্তর বিভাগ করিয়া অধিকতর আয়ের উপর উচ্চতর হারে কর-নির্ধারণের যে নীতি সাধারণতঃ অনুসৃত হইয়া থাকে তাহার প্রয়োগ বিশেষ সতর্কতার সহিত না করিলে, দেশের ধন-সঞ্চয় বিশেষরূপে প্রতিহত হইবার সম্ভাবনা। অধিক আয়ের উপর অত্যধিক উচ্চহারে কর ধার্য হইলে মানুষের কর্ম ও সঞ্চয়-প্রবৃত্তি কি ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। চার হাজার টাকা আয়ের উপর যদি একজনকে টাকা প্রতি চার আনা হিসাবে এক হাজার টাকা আয়-কর দিতে হয় এবং পাঁচ হাজার টাকার উপর দিতে হয় ছয় আনা হিসাবে ১৮৭৫৲ টাকা, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে এক হাজার টাকা অতিরিক্ত আয়ের জন্য ৮৭৫৲ টাকা কর দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় প্রায় কোন মানুষেরই অতিরিক্ত শ্রম দ্বারা অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। তাই অধিকতর আয়ের উপর উচ্চতর হারে কর-নির্ধারণ আধুনিক কালে সর্ববাদিসম্মত নীতি হইলেও ইহার হার নির্ধারণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

অধিকতর আয়ের উপর উচ্চতর হারে করনির্ধারণে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যকতা

প্রত্যেক দেশের ধনোৎপাদনের কতকগুলি স্বাভাবিক নিজস্ব ধারা আছে। এই সব বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আদিতে গড়িয়া উঠিলেও, ভাবিকালে ইহা দেশের ও জাতির মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভাবে বর্ধিষ্ণু জনপদ ও সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ধনোৎপাদনের এই বনিয়াদি ধারাকে কর নির্ধারণ দ্বারা এমন প্রবল ভাবে আঘাত করা সমীচীন নহে, যাহার ফলে ইহা পুরাতন খাত পরিত্যাগ করিয়া নূতন

প্রত্যেক দেশের ধনোৎপাদনের নিজস্ব ধারা ও তাহার সহিত তদ্দেশীয় করনীতির সহযোগীতার আবশ্যকতা

খাতে প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। কারণ নূতন অনভ্যস্ত খাতে ধনোৎপাদন পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে পারিবে না এবং যে জনপদ ও সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে হতশ্রী হইয়া পড়িবে। কি ভাবে ধনোৎপাদনের এই ধারার পরিবর্তন ঘটিতে পারে তাহা আরও একটু বিশদভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। যদি কোন পণ্যের উপর খুব উচ্চ হারে কর নির্ধারিত হয় তাহা হইলে ইহা খুবই স্বাভাবিক যে পণ্যোৎপাদনকারী ভবিষ্যতে তাহার মূলধন নিয়োগের সময় এমন শিল্প অনুসন্ধান করিবে, যাহার উপর উচ্চ হারে কর ধার্য হয় নাই। নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে অবশ্য তখনই সম্ভবপর যখন অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতার দণ্ড দিয়াও অনুচ্চ করের দরুণ তাহার সুবিধা ও লাভ বেশী হইবে। সাবেক মূলধন ও পুরাতন শিল্পিগণকে নূতন পথে পরিচালিত করা সহজসাধ্য না হইলেও, নূতন মূলধন ও নূতন কর্মীর পক্ষে উচ্চ করের দরুণ নূতন পথ বাছিয়া লওয়া ততটা কঠিন হইবে না। করের চাপ কতটা অধিক হইলে পণ্যোৎপাদনকারী তাহার পরিচিত অভ্যস্ত কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিবে, তাহা অনেকটা নির্ভর করিবে পূর্ব পণ্যের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার উপর।

কয়েকটি কর যাহা ধনোৎপাদনের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নহে।

এখানে কয়েকটি করের নাম করা যাইতে পারে যাহা উচ্চহারে ধার্য হইলেও ধনোৎপাদনের কোন প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যথা, অপ্রত্যাশিত পড়ে-পাওয়া ধনের উপর উচ্চ হারে কর নির্ধারিত হইলেও ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে তাহা কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সহরের জমির উপর নির্ধারিত কর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে; কারণ জমির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ইহাকে গোপন করাও চলে না, অথচ ইহার প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান।

একচেটিয়া (monopolist) পণ্যোৎপাদনকারীদের উপরও করের প্রভাব অত্যন্ত কম ; যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার তুলনায় উচ্চ হারে কর দিয়াও ইহারা সহজেই নিজেদের লাভ বজায় রাখিতে পারে। উল্লিখিত তিন প্রকার কর ভিন্ন আর একটি পন্থা নির্দেশ করা যাইতে পারে যাহা ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে কোনরকম গোলমালের সৃষ্টি করিবে না। আমরা যদি এমনভাবে কর-নীতি নিয়ন্ত্রিত বা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হই, যাহার ফলে সর্বপ্রকার ধনোৎপাদনকারীর উপর সমভাবে করের চাপ পড়িবে, তাহা হইলে কর-বৈষম্যের দরুণ মূলধনের স্থানান্তরে বা বিষয়ান্তরে যাইবার সম্ভাবনা দূর হইতে পারে। এরূপ করের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে আয়-করের কথাই সর্বপ্রথম বিবেচনা করিতে হয়। কারণ ইহা হইতে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করা যেমন সহজ, ইহাকে স্বেচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করাও তেমনি সহজ। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে এই যে, যাহারা তাহাদের সমস্ত আয় ব্যয় না করিয়া তাহার একটা অংশ সঞ্চয় করে, তাহাদিগকে এই সঞ্চয় অপরাধের জন্য একাধিকবার দণ্ডনীয় হইতে হয়। কারণ সম্পূর্ণ আয়ের উপর এই কর একবার দিবার পর তাহার যে অংশ সঞ্চিত হইয়া কারবারের মূলধনরূপে নূতন আয়ের সৃষ্টি করিবে তাহাকে পুনরায় এই কর-ভার বহন করিতে হইবে। এইভাবে আয়-কর সঞ্চয়ের খানিকটা প্রতিকূলতা সাধন করিয়া থাকে এবং ইহাকে আমরা সম্পূর্ণ অ-ভেদমূলক কর (non-differential tax) বলিতে পারি না। আয়-করকে সম্পূর্ণ সমদর্শী করিতে হইলে, ইহাদের মতে আয় হইতে সঞ্চিত অংশ বাদ দিয়া তাহার উপর কর নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তখন ইহাকে আয়-কর (income-tax) না বলিয়া আমরা ব্যয়-কর (tax on expenditure) ও বলিতে পারি। যাহা হউক, আয়-করের বিরুদ্ধে এই যুক্তি অতিশয় সূক্ষ্ম ও সারহীন বলা যাইতে পারে।

ধনোৎপাদনের স্বাভাবিক ও প্রচলিত ধারার পরিবর্তন সাধন করা যদিও সাধারণ নীতি অনুযায়ী বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুনীতির প্রতিকূল ব্যবসায়ে ধন ও শ্রম বিনিয়োগ কখনই সমর্থন-যোগ্য হইতে পারেনা। চীনদেশে অহিফেন, বাঙ্গালা-দেশে গাঁজা এবং পাশ্চাত্য দেশে মদের ব্যবসা বিশেষ লাভজনক হইলেও উল্লিখিত কারণে সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইহাদের উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করার ফলে যদি এই সব ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধন ও শ্রম ব্যবসান্তরে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে ততটা ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে না।

কোন্ ক্ষেত্রে ধনোৎপাদনের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন সমর্থন যোগ্য

আধুনিক যুগে ধনোৎপাদনের স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিহত করিবার সর্বাপেক্ষা প্রধান অস্ত্র দাঁড়াইয়াছে—সংরক্ষণ শুল্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর নির্বিরোধ নীতি (Laissez Faire Policy) ও অবাধ বাণিজ্য নীতি (Free trade Policy) পরিত্যাগ করিয়া যে দিন শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান দেশসমূহ রক্ষণশীল নীতি (Protection Policy) অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং শিশু ও অক্ষম শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্যে প্রতিযোগীতার হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে, সেই দিন হইতে ধনোৎপাদনের স্বাভাবিক ধারাকেও গলা টিপিয়া মারিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই রক্ষণশীলতার ফলে পণ্যমূল্য অথবা করভার যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, স্বার্থবিশিষ্ট শক্তিশালী ধনিক সম্প্রদায়ের প্রভাবে এবং দেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার প্রলোভনে বর্তমান সময়ে প্রায় সর্বদেশই এই নীতি অসঙ্কোচে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

প্রচলিত ধনোৎপাদন ধারার প্রধান শত্রু কে

অত্যাধিক রাজস্ব সংগ্রহের জন্য অবিবেচনাপূর্বক বেশী উচ্চ হারে আয়-কর, সম্পত্তি-কর কিংবা পণ্যবিশেষের উপর শুল্ক নির্ধারণ করিলে দেশের

মূলধন বিদেশে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিদেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে উদ্ভূত লাভের উপরও যদি মালিককে ঐ একই হারে নিজের দেশে কর দিতে হয় তাহা হইলে তাহার লাভ হইবে না, অধিকন্তু বিদেশেও স্বল্প হউক বা বেশী হউক, একটা কর দিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহের মধ্যে যাহাতে এই 'দোকর' (double taxation) কর না দিতে হয় তাহার জন্য একটা চেষ্টা চলিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের ভাগেই পড়িয়াছে ক্ষতির অংশটা ('ভারতে সরকারী আয়' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মূলধনের বিদেশপ্রয়াণ ও দোকর কর

আমাদের দীর্ঘ আলোচনার সার সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইতেছে যে, উচ্চ হারে কর নির্ধারণ নীতি দেশের ধনোৎপাদনের কথঞ্চিৎ প্রতিকূলতা সাধন করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক ও সম্ভব। তবে ইহা কর্ম-প্রবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যত না ক্ষতি সাধন করিবে তদপেক্ষ অনেক বেশী ক্ষতি সাধন করিবে কর্ম-ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে হ্রাস করিয়া। কারণ আমরা দেখিয়াছি, কর—অবস্থা বিশেষে ও ব্যক্তিবিশেষে—কর্ম-প্রবৃত্তিকে হ্রাস না করিয়া বরঞ্চ অধিকতর উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে। কিন্তু কর নির্ধারণের অবিবেচনার ফলে দেশের দরিদ্র সাধারণের অভাব বৃদ্ধি পাইয়া যদি তাহাদের কর্ম-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষতি অপূরণীয়। মূলধনের অবস্থান্তর (Diversion of Capital) সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সুবিবেচনার সহিত কর-নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে এইরূপ অবস্থান্তর দেশের ধনোৎপাদনের বিঘ্ন সাধন না করিয়া বরং নূতন প্রেরণা দান করিতে পারে। পরিশেষে সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, কর হইতে সংগৃহীত অর্থের অপব্যয় না করিয়া যদি আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের ধনোৎ-পাদন সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিতে পারে; কারণ দেশের সমৃদ্ধি রাজস্বের সদ্ব্যবহারের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিংবা ভাষান্তরে দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই রাজস্বের সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত মাপকাঠি।

সার সিদ্ধান্ত

———

ধন-বৈষম্য নিবারণে করের প্রভাব

দেশের ধনোৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার করের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। কর নির্ধারণে দূরদৃষ্টি ও সামঞ্জস্য-জ্ঞানের অভাব ঘটিলে মানুষের কর্মাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম-ক্ষমতা, সঞ্চয়াকাঙ্ক্ষা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা কি ভাবে প্রতিহত হইয়া দেশের আর্থিক ক্ষতি-সাধন করিতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে দেশের ধন-বণ্টনের উপর বিভিন্ন প্রকার করের ফলাফল আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ধন-বৈষম্য সম্পর্কে করের আদর্শ কি?

আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধন-বৈষম্য অতি গুরুতররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বহুকাল হইতেই একটা গভীর অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল; তাহা বর্তমান সময়ে আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। যে বৈষম্যের মূলে ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বাভাবিক কারণগুলি যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে, যাহাকে অনেকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া মনে করেন, কর-নির্ধারণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সেই বৈষম্যকে দূর করিবার প্রয়াস শুধু নিষ্ফল নহে, অসঙ্গত—এইরূপ অভিমত উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন পণ্ডিত পোষণ করিলেও বর্তমান যুগে তাহা অচল। এইরূপ মতবাদ দ্বারা পরিপুষ্ট কর-নীতি বর্তমান সময়ে সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যদি জগতে ধন-বৈষম্য বিদ্যমান না থাকিত, সকলেই আমরা সমান ধনবান বা নির্ধন হইতাম, তাহা হইলে সকলের উপর সমভাবে কর-নির্ধারণ করিলেই চলিতে পারিত, অত বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু অবস্থা যখন অন্যরূপ, তখন কর-নির্ধারণ ব্যাপারে আমাদিগকে এরূপ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা আমরা এই ধন-বৈষম্যের অন্ততঃ

খানিকটা উপশম করিতে পারি। অবশ্য এরূপ নীতি অনুসরণ করিবার সময়ে আমাদিগকে ইহাও ভালরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনীদের উপর অত্যধিক কর ধার্য করিতে যাইয়া আমরা তাহাদের ধনোৎপাদনের বা ধন-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া না বসি। সুতরাং আদর্শ কর-নীতি বলিতে আমরা বর্তমান সময়ে ইহাই বুঝিব যে, দেশের ধনোৎ-পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়া এরূপভাবে কর-নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে সমাজের ভিতরকার ধন-বৈষম্য প্রশ্রয় না পাইয়া যথাসম্ভব প্রশমিত হইতে পারে; বলা বাহুল্য, শাসনের কলকাঠিটি অধিকাংশ দেশে ধনীদের হাতে থাকায় এই আদর্শ পূর্ণভাবে আদৌ প্রতিপালিত হইতেছে না—গণ-জাগরণের ফলে অবস্থার চাপে স্ব-ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় খানিকটা স্বীকৃত ও অনুসৃত হইতেছে মাত্র।

কর-নীতির পূর্ব ও বর্তমান আদর্শ

বর্তমান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ধনী নির্ধন সকলকে একই হারে কর দিবার প্রথা (Proportional taxation) প্রচলিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, যাহার আয় যত বেশী তাহাকে তত কম নিরিখে কর দিতে হইবে—এই (regressive taxation) নীতিও বহু ক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল। এই অদ্ভুত নীতির মূলে সম্ভবতঃ এই যুক্তি নিহিত ছিল যে, নিম্ন হারে কর দিলেও মোটের উপর ধনী ব্যক্তিকে দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী টাকা কর দিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই উভয় নীতি (Proportional and regressive—আনুপাতিক ও ক্রমহ্রাসমান) সর্ব দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎস্থলে যাহার আয় যত অধিক, অথবা যিনি যত বেশী ধনী তাঁহাকে তত অধিক উচ্চ হারে কর দিতে হইবে এই ক্রমবর্ধমান নীতি (Progressive taxation) আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া, ধনোৎপাদনের লাভ-ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কর নির্ধারণ দ্বারা মানুষের ধন-বৈষম্য দূর করাই যদি আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত,

তাহা হইলে আয়ের ঊর্ধ ও নিম্ন এই দুইটী সীমা নির্দেশ করিয়া নিম্ন সীমার নীচের সকল আয়কে কর হইতে একেবারে মুক্তি দিয়া, ঊর্ধ সীমার উপরের সকল আয় করের নামে কাড়িয়া লইলেই চলিত। যথা, পাঁচ হাজার টাকার অনধিক বার্ষিক আয় যাহাদের, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করের হাত হইতে একেবারে রেহাই দিয়া, বিশ হাজার টাকার অতিরিক্ত আয়ের সম্পূর্ণটা রাজ-করস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যাইত। ইহা শুনিতে ভাল; কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি করিলে ইহা উচ্চাভিলাষী, শক্তিমান পুরুষের কর্মাকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করিয়া দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করিবে—ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন যদি নাও উত্থাপন করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পুঁজিবাদমূলক সমাজে এতটা বাড়াবাড়ি এখনো কল্পনাতীত। তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা ক্রমেই যেরূপ জটিল ও ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশের কর্তৃপক্ষকেও উচ্চ আয়ের উপর ক্রমেই উচ্চতর নিরিখে কর নির্ধারিত করিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু নিম্ন আয়কে অধিকতর রেহাই দেওয়া যাইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কর-নীতির আর একটি আদর্শ।

কর-নীতির আরও একটি আদর্শ আমাদিগকে এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কর সংখ্যায় বহু হইলে চলিবে না। কারণ তাহা আদায় করা যেমন কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ, তেমনি করদাতাগণের পক্ষেও বিরক্তিকর। অপর পক্ষে করের সংখ্যা খুব কম হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ মাত্র দুই চারিটী করের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয় এবং সে চেষ্টা করিতে গেলে এক শ্রেণীর উপর অত্যধিক জুলুম হইবে ও অপর অনেকেই একেবারে বাদ পড়িয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের উল্লিখিত মূল নীতি বজায় রাখিয়া পরিমিত সংখ্যক

কতকগুলি করের সাহায্যে আমাদিগকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইবে।

আমরা এক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলিত করগুলি আমাদের মূল আদর্শে কতখানি পরিপোষক, তাহা একে একে আলোচনা করিব

কোন্ কর কোন্ আদর্শের পরিপোষক

প্রথমতঃ কয়েকটি প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে বিচার করা যাক। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল হইতেছে "পোল ট্যাক্স" (মাথাপিছু কর) পূর্বকালে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রত্যেকের নিকট হইতে এই কর বাবদ আদায় করা হইত। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে বাদশাহগণ হিন্দুদের নিকট হইতে এইরূপ কর আদায় করিতেন। "জিজিয়া" কর নামে ইহা ইতিহাসে কুখ্যাত আকবর ন্যায়বিগর্হিত বিবেচনায় ইহা প্রত্যাহার করিয়া হিন্দু-সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব ইহা পুনঃ প্রবর্তিত করেন। কর হিসাবে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল এবং বর্তমান যুগে অচল। কারণ ইহার মারফতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়। সকলের অবস্থা যদি সমান হইত, তাহা হইলে এইরূপ করের উপযোগিতা আমরা স্বীকার করিতে পারিতাম। সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট সর্বপ্রকার জীবিকার্জনের উপর ৩০৲ টাকা হিসাবে একটি কর ধার্য করিয়াছেন। ইহাকে পোল ট্যাক্সের নূতন সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ইহাকে একপ্রকার "জিজিয়া" কর বলা যাইতে পারে। তবে যাহার বার্ষিক আয় ২,০০০৲ টাকার অনধিক তিনি ইহার হাত হইতে রেহাই পাইবেন। দুই হাজার টাকার উর্ধে যাহার আয় তাহাদিগকে আয়-কর ভিন্ন এই ৩০৲ টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে। ইহার ফলে রাজার কড়ি যোগাইবার বেলায় দুই হাজার ও দুই লক্ষ টাকার মালিক একই

পোলট্যাক্স ও "জিজিয়া" কর

পংক্তিতে স্থান পাইলেন। যুক্ত-প্রদেশেও এইরূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বাংলা দেশের মত সেখানে সকলকে একই পরিমাণ টাকা (৩০৲ টাকা) এই বাবদ দিতে হইবে না—যাহার আয় যত বেশী তাহাকে আনুপাতিক কর-নীতি (Proportional taxation) অনুযায়ী তত বেশী টাকা কর দিতে হইবে।

আয়-কর

আয়-কর আদর্শ কর হিসাবে সর্বদেশে সর্বাগ্রগণ্য; কারণ ইহার সাহায্যে একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, অন্যদিকে তেমনই করদাতাদের অবস্থানুযায়ী করের হার নির্ধারণ করিয়া আয়ের বৈষম্যকে অনেকটা খর্ব করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণী বা স্তর ভাগ করিয়া কোন্ স্তরে কি হারে আয়কর নির্ধারণ করা সঙ্গত, ইহা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। আধুনিক যুগে ধনীরা লজ্জার খাতিরে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর হারে কর দিতে সম্মত হইলেও, ইচ্ছামত ইহাকে বাড়িতে দিতে রাজি নন। অন্যদিকে সাধারণ অবস্থার করদাতাগণ ধনীদের তুলনায় অধিকতর অনুগ্রহ ও সুবিবেচনা দাবী করেন। এদিকে দেশ-শাসন, দেশ-রক্ষা, নূতন যুদ্ধ-ভীতি ও পুরাতন যুদ্ধের জের ইত্যাদি বাবদ রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় বিভিন্ন অবস্থার করদাতাগণের পরস্পর-বিরোধী দাবীগুলির সামঞ্জস্য সাধন সহজ নহে। তারপর কতটা আয়কে করের হাত হইতে রেহাই দেওয়া যাইবে, তাহা নির্ধারণ করা লইয়াও বেশ মতভেদ রহিয়াছে। আমাদের দেশে করধার্যের যোগ্য সর্বনিম্ন বার্ষিক আয় ২,০০০৲ টাকা। ইহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-মন্দা হেতু ১৯৩১ সালের পর গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ঘাটতি উপস্থিত হইলে কয়েক বৎসরের জন্য বার্ষিক এক হাজার টাকা (১,০০০৲) পর্যন্ত আয় কর-ধার্যের যোগ্য নির্ধারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি যে নূতন সংশোধিত আয়কর আইন পাশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা বার্ষিক ৮,০০০৲ টাকা হইতে ২৪,০০০৲ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর

নূতন ভারতীয় আয়-কর আইনের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ

করের নিরিখ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস ও ২৪,০০০৲ টাকার উর্ধে পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে পঞ্চাশ সহস্র ধনী ব্যক্তির করভার বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু আনুমানিক আড়াই লক্ষ লোকের করভার লাঘব হইবে; অথচ কেবলমাত্র ইহা হইতেই গবর্ণমেন্টের মোটের উপর অন্যূন দুই কোটী টাকা আয় অধিক হইবে! ইচ্ছা করিলে আয়-করের সাহায্যে ধন-বৈষম্য লাঘব করিয়াও সরকারী আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজসাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত ধনীদের উপর অতিরিক্ত করভার চাপাইবার দরুণ দেশের ধনোৎপাদন যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

উত্তরাধিকার কর

উত্তরাধিকার কর (Inheritance Tax)ও আধুনিক কালের একটি বিশেষ উপযোগী কর। ইহার সাহায্যেও যথেষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং সম্পত্তির মূল্যানুযায়ী উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী হারে কর আদায় করিয়া আমাদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে। অধিকন্তু সাধারণ অবস্থার লোকদিগকে আমরা ইহার হাত হইতে একেবারেই মুক্তি দিতে পারি। সুতরাং এই করের সাহায্যে সাম্যবাদের মর্যাদা-রক্ষা ও অর্থ-সংগ্রহ দুইই চলিতে পারে; তবে আয়-করের বেলায় যেমন, এইখানেও তেমনি "সাপও মারা যাইবে, লাঠিও ভাঙিবে না"—ইহা সর্বদা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

এই কর কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কালে কয়েকটী বিষয়ের উপর আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ আমরা যদি এই নিয়ম অনুসরণ করি যে, যে যত অধিক সম্পত্তি বা অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে

প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে তত অধিক কর দিতে হইবে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি একবার একজনের নিকট হইতে ১০,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইবে তাহাকে, যে ব্যক্তি দুইবারে দুইজনের নিকট হইতে ৫,০০০৲ টাকা করিয়া ১০,০০০৲ হাজার টাকা পাইবে, তাহার অপেক্ষা অধিক কর দিতে হইবে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি এই নিয়ম করি যে, কোন মালিকের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি ওয়ারিশ-গণের মধ্যে বণ্টন হইবার পূর্বেই উহার মূল্যানুযায়ী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় করা হইবে, তাহা হইলে যেখানে সম্পত্তির মূল্য সমান, কিন্তু এক ক্ষেত্রে মাত্র একজন ওয়ারিশ ও অন্য ক্ষেত্রে একাধিক ওয়ারিশ বর্তমান, সেখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেও উভয় পক্ষকে সমান কর দিতে হইবে। ইহাও ন্যায়সঙ্গত নহে। উত্তরাধিকারিগণের দূরত্ব অনুযায়ী উচ্চ হারে কর দিবার যে রীতি ইংলণ্ডে প্রচলিত, তাহাও এক অর্থে অসঙ্গত এবং প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ সাধারণতঃ দূর-আত্মীয়গণ নিকট-আত্মীয় অপেক্ষা কম সম্পত্তি পাইয়া থাকে। তদুপরি তাহাদিগকে যদি বেশী কর দিতে হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে প্রগতি-বিরোধী (anti-progressive অর্থাৎ regressive) কর বলিব। এই সকল অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া অনেকে মনে করেন যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সহিত উত্তরাধিকারিগণের পূর্ব সম্পত্তির মূল্য যোগ করিয়া, প্রত্যেকের উপর পৃথকভাবে কর নির্ধারণ করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্যাগুলির হাত হইতে সহজেই রেহাই পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত—রাম যদি ওয়ারিশসূত্রে দশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, আর রহিম প্রাপ্ত হয় পোনর হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি, তাহা হইলে সাধারণ (progressive taxation) নিয়মানুযায়ী দশ হাজার টাকার উপর, ধরা যাক শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে, রামকে দিতে হইবে কর বাবদ এক

হার প্রয়োগে খুঁটিনাটি

হাজার টাকা এবং পোনর হাজার টাকার উপর শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে রহিমকে দিতে হইবে আঠার শত টাকা। কিন্তু যদি রাম ও রহিমের পূর্বাধিকৃত সম্পত্তির মূল্য যথাক্রমে বিশ ও দশ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে উত্তরাধিকার করের নিরিখ নির্ধারণের সময় ওই মূল্যও গ্রহণ করিতে হইবে; এবং রামকে ত্রিশ হাজার টাকার উপর নির্ধারিত নিরিখে এবং রহিমকে পঁচিশ হাজার টাকার উপর নির্ধারিত নিরিখে কর দিতে হইবে। এ ভাবে কর ধার্য হইলে পূর্বোল্লিখিত অসাম্য ও অসঙ্গতি ঘটিবে না, ইহাই অনেকের অভিমত।

সম্পত্তির উপর নির্ধারিত প্রত্যক্ষ করও ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসারে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। আয়-করের ন্যায় পরিমিত সম্পত্তির মালিককে এই কর হইতে মুক্ত রাখিয়া অধিক মূল্যের সম্পত্তির উপর মূল্যানুসারে ইহা ধার্য করা যাইতে পারে। মূল্যের উপর কর নির্ধারণ করিয়া এককালীন উহা আদায় করিয়া লওয়া অপেক্ষা বার্ষিক আয়ের উপর নির্ধারণ করিয়া প্রতি বৎসর উহা আদায় করাই অধিকতর সুবিধাজনক। তবে এইরূপ অভিমতও অনেকে পোষণ করেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর বহু দেশের ঋণের বোঝা এরূপ সহনাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐ সব দেশের ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের বিপুল সম্পত্তির একটা অংশ মাত্র করস্বরূপ আদায় করিয়া লইলে এই বিরাট জাতীয় ঋণ নাকি অনায়াসে পরিশোধ হইয়া যাইতে পারে এবং আর সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারে। এইরূপ অভিমত হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ধনবানদের কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাই।

সম্পত্তি-কর

আধুনিক কালে যৌথ কারবারের লভ্যাংশের উপর নির্ধারিত কর হইতে একটা মোটা টাকা আয় হইয়া থাকে। ইহা আয়করেরই অন্তর্গত; কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে, লভ্যাংশানুযায়ী করের নিরিখ

স্থির করিলেই ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসরণ করা হইবে, তাহা হইলে তিনি ভ্রম করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্, দুইটি কারবার যথাক্রমে মূলধনের উপর শতকরা ১০৲ টাকা ও ৫৲ টাকা হারে লাভ অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং প্রথমোক্ত কারবারের লাভের উপর শেষোক্ত কারবার অপেক্ষা দ্বিগুণ হারে কর নির্ধারিত হইয়াছে। এ দিকে রাম প্রথমোক্ত কারবারে এক হাজার টাকার অংশীদার এবং রহিম দ্বিতীয় কারবারের পাঁচ হাজার টাকার অংশীদার—তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, রামকে কম টাকার উপর অধিক হারে কর দিতে হইতেছে এবং রহিম মোটের উপর অধিক টাকা লাভ করিয়াও নিম্ন হারে কর দিয়া রেহাই পাইতেছে। সুতরাং এইরূপ কর নির্ধারণ বাহ্যতঃ ক্রমবর্ধমান বা প্রগতিশীল মনে হইলেও কার্য্যতঃ প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষে অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণের পূর্বেই কোম্পানীর মোট লাভ হইতে সর্বোচ্চ নিরিখে আয়কর কাটিয়া রাখা হয়। অধিকাংশ অংশীদারের সমষ্টিগত আয় উচ্চতম হারে কর দিবার মত নহে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরে প্রমাণ দিয়া এইরূপ অতিরিক্ত কর গবর্ণমেণ্ট হইতে ফেরৎ পাইতে পারেন বটে; কিন্তু কার্যতঃ অনেকের পক্ষেই ব্যয় ও হাঙ্গামার জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। ফলে নগণ্য অংশীদারগণকেও শেষ পর্যন্ত ধনী অংশীদারের তুল্য-নিরিখে কর বহন করিতে হয়।

যৌথ কারবারের লভ্যাংশের উপর কর ও ক্রমবর্ধমান নীতি

আমরা এতক্ষণ যে সকল কর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহারা সবই প্রত্যক্ষ কর। এ সব কর কর-দাতাদের অবস্থানুযায়ী ইচ্ছানুরূপ বাড়ান কমান যায় এবং এই উপায়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে খানিকটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। এক্ষণে আমরা পরোক্ষ করের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, নিত্য

ব্যবহার্য সাধারণ জিনিসের উপর নির্ধারিত শুল্কের ফল প্রতিক্রিয়াশীল। তন্মধ্যে আহার্য দ্রব্যের উপর নির্ধারিত শুল্ক বিশেষরূপে সাম্য-নীতির বিরোধী। কারণ সুস্থ দেহ ধারণের জন্য পুষ্টিকর আহার্যের প্রয়োজন ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান

পণ্য শুল্ক বা পরোক্ষ-কর সাম্যনীতির পরিপন্থী কি না

What is sauce for the gander is not sauce for the goose—ধনীর দেহ সুস্থ রাখিবার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন, দরিদ্র বলিয়া তাহার দেহের জন্য উহার প্রয়োজন নাই—একথা বলা চলে না। সুতরাং যদি নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিসের উপর একই হারে কর ধার্য করা হয়, তাহা হইলে আয়ের স্বল্পতা হেতু দরিদ্রের উপর চাপ বেশী পড়িবে, ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ এই প্রকারের পণ্যের উপর বিভিন্ন হারে কর নির্ধারণের উপায়ও নাই। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য, জীবন-ধারণের জন্য অপরিহার্য ও সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর ধার্য না করিয়া কিংবা যথাসম্ভব কম ধার্য করিয়া, ধনীদের দামী বিলাস-সামগ্রীর উপর উচ্চ হারে শুল্ক বা কর ধার্য করা। এই উপায়ে পরোক্ষ করের প্রতি-ক্রিয়াশীল প্রভাব কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে আপত্তি উঠিতে পারে, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে শুধু বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক ধার্য করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভবপর কিনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আয়করের বেলায় আমরা দেখিয়াছি, অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের উপর করের হার হ্রাস করিয়া দিয়া ও উচ্চতর আয়ের উপর কর-হার সামান্য বাড়াইয়া দিয়া ২ কোটী টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা যাইতেছে। গরীবের ।৴০ আনা মূল্যের লবণের উপর ১॥০-২৲ টাকা শুল্ক ধার্য না করিয়া রেশম, পশম, সেণ্ট-পমেটম, যান-বাহন ইত্যাদি নানাবিধ সাজ-সরঞ্জামের মধ্য হইতে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক বাছাই করিয়া ধনী সম্প্রদায়ের কতকগুলি বিলাস-সামগ্রীর

উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করিলে সব দিক বজায় রাখিয়া সহজেই সরকারী আয় বাড়ান যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পণ্যশুল্ক বা পরোক্ষ করের প্রতিক্রিয়াশীল পরিণাম প্রতিরোধ করিতে হইলে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

পণ্য শুল্ক ও উচ্চতর হারে ব্যয়-কর

আর একটি উপায় নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত কোথাও অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সেটি হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তি যত অধিক ব্যয় করিবে (অর্থাৎ যত অধিক পণ্য বা শ্রম ক্রয় করিবে) তাহাকে তত উচ্চ হারে কর দিতে হইবে। সাধারণ অবস্থার লোকের তুলনায় ধনী ব্যক্তি নিশ্চয়ই এইভাবে বেশী ব্যয় করিয়া থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য জিনিস খরিদের বেলায় দরিদ্র ব্যক্তির সহিত ধনীর ব্যয়ের পরিমাণ সমান হইলেও, বিলাস সামগ্রীর জন্য তাহার ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হইবে এবং তদ্দরুণ ধনী ব্যক্তিকে উচ্চতর নিরিখে কর দিতে হইবে এবং এইরূপে পণ্য শুল্কের ক্ষেত্রেও ন্যায় ও সাম্যের মর্যাদা রক্ষা পাইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ব্যয়ের হিসাব চেক করা যাইবে কোন্ উপায়ে? তাই বিষয়টি বেশ চিত্তাকর্ষক হইলেও, কর্মক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বা প্রয়োগ এক প্রকার অসম্ভব।

সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে পরোক্ষ কর বা পণ্য-শুল্কের ফলাফল আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইহারই একটি শাখা আমদানি বা রক্ষণ-শুল্ক সম্বন্ধে

আমদানি বা রক্ষণ-শুল্কের প্রকৃতি

পৃথকভাবে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাও পণ্যশুল্কই—তবে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক। ইহা দ্বারা যথেষ্ট রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়া সর্বসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে—যদি দেশের ধনীরা অত্যধিক স্বার্থপর না হন। কিন্তু এই সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক নির্বাচনে দুইটী বিষয়ে খেয়াল বা দৃষ্টি রাখা

আবশ্যক। প্রথমতঃ যে সব কৃষি ও শ্রম-শিল্পের সম্ভাব্যতা প্রচুর, তাহাদের রক্ষার জন্যই শুধু এইরূপ আমদানি শুল্ক নির্ধারিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সর্বসাধারণের পক্ষে হিতকারী ও প্রয়োজনীয় পণ্যকে যথাসম্ভব আমদানি শুল্ক হইতে রেহাই দিয়া ধনীর বিলাস-সামগ্রীর উপরই ইহা প্রধানতঃ আরোপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা শুধু পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দরিদ্র-সাধারণের কষ্টই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অন্যদিকে কৃষি-শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের সাধারণ শ্রীবৃদ্ধির কোন উপায় হইবে না। আমাদের দেশে এযাবৎ কাল আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণে কর্তৃপক্ষ নিজেদের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানতঃ কাজ করিয়া আসিয়াছেন। সাধারণের পক্ষে হিতকর কর-নীতির সহিত তাহার সম্পর্ক অতি সামান্য। এই বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সার সিদ্ধান্ত

আমাদের বর্তমান আলোচনার সারাংশ তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, প্রত্যক্ষ করগুলির সাহায্যে ধন-বৈষম্য প্রতিরোধ করা অনেকটা সম্ভবপর; কিন্তু পরোক্ষ কর এ বিষয়ে অনেকটা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। অবশ্য প্রত্যেক দেশেই কতকগুলি কর অল্পবিস্তর প্রতিক্রিয়াশীল (regressive); কিন্তু আমাদের দেখিতে হইবে সমষ্টিগত করের প্রভাব যাহাতে প্রগতিশীল (progressive) হয় অর্থাৎ যে যত বেশী ধনবান, তাহাকে যেন তত উচ্চ হারে কর দিতে হয়। এই নীতি অনুসরণ করিতে পারিলেই যে বৈষম্য দূর হইয়া সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশ্বে সত্যকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা অত সহজ ব্যাপার নহে। বর্তমান কালে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এতই জটিল ও জটপাকানো যে, ইচ্ছা থাকিলেও সামান্য সামান্য বিষয়ে সুবিচার করাও সহজসাধ্য নহে। যথা, করের হার নির্ধারণের সময় উভয় ব্যক্তির আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করি;

কিন্তু উভয়ের আশ্রিত বা পোষ্য-সংখ্যা বিবেচনার মধ্যে আনি না। বিবাহিত ও অবিবাহিতের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা আজিও করি না। তারপর বিভিন্ন ব্যক্তির আয়ের অঙ্কটার দিকেই শুধু আমরা নজর দেই; কিন্তু তাহাদের আয়ের পথ বা শ্রমের পার্থক্য সম্বন্ধে বিচার করি না। এইরূপ বহু অন্যায় বহু ক্ষেত্রে আজও আত্মগোপন করিয়া টিকিয়া আছে, ভবিষ্যৎ প্রতিকারের অপেক্ষায়।

ইংলণ্ডে ধনীদের উপর কর-বৃদ্ধির নমুনা

আমরা আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে ইংলণ্ডের ন্যায় ধনতান্ত্রিক দেশে বিগত ২৫ বৎসরে, বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের পরে, ধনীদের উপর করের হার কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার একটি সরকারী হিসাব নিম্নে দিতেছি। ভারতবর্ষের এরূপ একটী হিসাব সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের দেশ ধনবানদের পক্ষে এখনো স্বর্গরাজ্য কিনা এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইত।

কর বাবদ প্রদত্ত আয়ের অংশ (শতকরা)।

করদাতার আয়	স্বোপার্জিত আয়ের অংশ				সম্পত্তির আয়ের অংশ		
£ পাউণ্ড	১৯০৪	১৯১৪	১৯১৯	১৯২৬	১৯০৪	১৯১৪	১৯১৯
৫০	৯·১	৮·৭	×	×	৯·১	৮·৭	×
	৫·৬	৪·৮	১০·৩	১০·২	৭·৮	৭·০	১২·৪
১	৭·৪	৬·৬	১৯·৪	১১·০	১০·৩	১২·২	২৬·৫
৫	৫·৬	৬·৮	৩৭·২	২৩·২	৯·৬	১২·৪	৪৩·৫
১০	৫·১	৮·১	৪২·৬	৩১·২	৯·৫	১৫·১	৫০·৩
২০,	৪·৯	৮·৩	৪৭·৬	৩৭·৫	১০·০	১৬·০	৫৮·১
৫০,	৪·৮	৮·৪	৫০·৬	৪৪·৪	১০·২	১৮·১	৬৩·৯

কর-নীতি

২য় খণ্ড

ভারতের রাজস্ব-নীতি

ভারতের সরকারী আয়-ব্যয় বা রাজস্বনীতি আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের প্রথমেই এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নহে। **A subject nation has no politics**—পরাধীন জাতির আবার রাজনীতি কি?—এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ততোধিক সত্য কথা হইতেছে, **a subject nation has no finance.** পররাজ্য জয় ও শাসনের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির পার্থক্য কোন্‌খানে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদিগকে বিশ্ববিজয়ী বীর সেকেন্দর সাহের সহিত জনৈক দস্যুর সরস ও প্রাণ খোলা কথোপকথনের ঐতিহাসিক গল্পটি স্মরণ করিতে হয়। অবশ্য অতীত ও বর্তমানের কার্য-প্রণালীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য দেখা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা কাল ধর্মের দরুণ। কারণ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ হইতেছে বেদনাহীন দন্তোৎপাটনের (painless extraction-এর) যুগ। সেই জন্যই প্রক্রিয়া রোগীর নিকট অনেক সময়েই অগোচর ও অপ্রকাশিত থাকে। এই সব কারণে আমরা যদি প্রত্যাশা করি যে আমাদের দেশের রাজস্ব-নীতি সর্বদা জনহিতকর পথে পরিচালিত হইবে তাহা হইলে গোড়াতেই ভুল করা হইবে। স্বাধীন দেশের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে সেখানে পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই যে, শাসক শ্রেণী নিজের স্বজাতির উপর শাসনের নামে শোষণ চালাইয়া আসিয়াছেন। বহু সংগ্রাম, বিদ্রোহ ও রক্তপাতের পর দেশের প্রজাসাধারণ এই শোষণের হাত হইতে আংশিক রক্ষা পাইয়াছে এবং **"no taxation without representation"** গণ-তন্ত্রের এই মূল নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। যেখানে স্বজাতির উপর স্বজাতি, দেশ-

পরাধীন জাতির অর্থনীতি

বাসীর উপর স্বদেশবাসী অর্থলোভে এরূপ অত্যাচার করিতে পারিয়াছে—সেখানে বিদেশী শাসক-শ্রেণীর নিকট স্বায়ত্ত-শাসনহীন ভারতবাসী আদর্শ রাজস্ব-নীতি কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পারে? তাই আমাদের দেশে, "No taxation without representation," কর-নীতির এই প্রথম ও মূল সূত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি—taxation without representation—ইংরেজ শাসনের প্রায় দুইশত বৎসর পরে আজও এক প্রকার চলিয়া আসিয়াছে। শাসকের রাজদণ্ড যেখানে জনমতের কোনরূপ অপেক্ষা রাখে না, রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে না, ক্ষমতা যেখানে অপ্রতিহত, সেখানে আমাদের স্বার্থ পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইবে, আমাদের শিল ও আমাদের নোড়ায় আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গা যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি! কারণ রাজনৈতিক পরাধীনতার সহিত অর্থনৈতিক দাসত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা, নিজ বাসভূমে যাহারা পরবাসী, তাহারা নিজগৃহের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা নিজের ইচ্ছানুরূপ করিতে পারিবে ইহা প্রত্যাশা করা যায় না।

কোম্পানীর যুগের অরাজকতা—সিপাহী বিদ্রোহ, তৎপর ভারত-সচিবের সার্বভৌমত্ব

কোম্পানীর শাসনের প্রথম ৬০।৭০ বৎসরের কথা আলোচনা না করাই ভাল, আমরা তাহা করিবও না। কোন জাতির ভাগ্যেই এমন ভয়ঙ্কর দুর্দিন যেন ভগবান কখনও না লিখেন। নগ্ন অরাজকতার মধ্যে সে এক শোষণ, লুণ্ঠন, উৎপীড়নের ভয়ঙ্কর দিন গিয়াছে। ১৮৫৭ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের পর, বিলাতের পার্লামেণ্ট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ভারতের শাসন-ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং সেই সময় হইতে এই দেশের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের কর্তৃত্ব-ভার ভারত-সচিবের উপর ন্যস্ত

হয় এবং সর্ব বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ইহাই নির্ধারিত হয়। সাত সহস্র মাইল দূরে বসিয়া, জনমতের বহু উর্ধে থাকিয়া, একচ্ছত্র 'জার'-এর ন্যায় তিনি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, ইংলণ্ডের শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক স্বার্থের নিকট একপ্রকার প্রকাশ্যরূপে ভারতের স্বার্থ বিসর্জিত হইতে লাগিল। এই অবস্থা একটানা চলিয়া আসিয়াছে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে ইংরেজ জাতির সমূহ বিপদ উপস্থিত হইলে দরিদ্র ভারতবাসী অকাতরে ধন ও জন দ্বারা তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে এবং আশা পোষণ করে যে, যুদ্ধাবসানে ইংরেজের নিকট হইতে নিজ দেশ শাসন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভ করিবে। আমাদের ইংরেজ প্রভুরাও আমাদের হৃদয়ে এই আশা সঞ্চারের পক্ষে অনেক মিষ্ট মধুর বাক্যজাল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকালে ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার মূলে ভারতবাসীর ভাগ্যের অতি সামান্য পরিবর্তনই ঘটিল! লাভ হইল—রাজস্ব ও আর্থিক-নীতি নিয়ন্ত্রণের ভার ভারত-সচিবের স্থলে বড় লাটের উপর অর্পিত হইল। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থা পরিষদের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মত গ্রহণ করিতে বা তদনুযায়ী কার্য করিতে আইনতঃ বাধ্য না থাকায় ভারতীয়দের ভাগ্য পরিবর্তন ফলতঃ কিছুই হইল না। ১৯৩৫ সালে

১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন ও তন্মূলে প্রধান পরিবর্তনের স্বরূপ।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারত শাসন আইনের যে নূতন সংস্করণটি ভারতবর্ষকে উপঢৌকন দিয়াছেন তাহা দ্বারা এক হাতে যেমন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইয়াছে, অন্য হাতে প্রাদেশিক লাটগণের ক্ষমতা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশকে প্রতিরোধ করা হইয়াছে। সর্বোপরি সকল শক্তির উৎস কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর দেশবাসীর বিশেষ কোন

ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু আর্থিক-নীতি নিয়ন্ত্রণের যে একটি অলেখিত অধিকার (fiscal autonomy convention) সম্প্রতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা ১৯৩৫ সালের আইন মূলে পরিষ্কার-ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে—যাহা অস্পষ্ট এবং অপ্রকাশিত ছিল তাহা রূঢ় বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, জাহাজ পরিচালনা ইত্যাদি কোন বিষয়ে ভারতের স্বার্থের জন্য ইংরেজ জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না, ইহা বর্তমান আইনে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রাদেশিক লাটগণের কখনও যে সব ক্ষমতা ছিল না, অত্যন্ত ব্যাপকভাবে তাহাদের হস্তে সে সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতবাসীর লাট পদে নিযুক্ত হইবার যে দৃষ্টান্ত পূর্বে আমাদের দু'চার বার দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহা আর ঘটিতেছে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (dominion self-govt. or status) বাক্যটি পর্যন্ত নূতন শাসন আইনের কোথাও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারূপেও উল্লিখিত হয় নাই,—যদিও পূর্বে এইরূপ শাসনের প্রতিশ্রুতি আমরা বহুবার বহু বড় কর্তার মুখে শুনিয়াছি। কাহারও বুকের উপর কেহ চাপিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাকে উঠিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইলে বুকের উপর উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে নামাইবার চেষ্টা করা ভিন্ন তাহার আর কি উপায় থাকিতে পারে? কিন্তু সেই চেষ্টা করিতে গেলেই বুকের উপর উপবিষ্ট ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অসুবিধা অনিবার্য। তাই পতিত ব্যক্তিকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া গেলেও বুকের বোঝা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া যাইবে কি প্রকারে?

যদিও আমাদের দেশে কেবল মাত্র ১৮৯২ সাল হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই পরিষদে জন সংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয় ভারতবাসী গুটিকয়েক প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে, তথাপি দেশের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই সব প্রতিনিধিগণকে কার্যতঃ কোনরূপ

ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। বক্তৃতার দ্বারা সরকারী কার্যের সমালোচনা এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন থাকিলে তাহার অনুগ্রহে দু'চারিটি নির্দোষ বে-সরকারী আইন প্রণয়ন করা ভিন্ন ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণের আর কোনও ক্ষমতাই ছিল না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব-নীতি যথাক্রমে সপারিষদ বড় লাট ও প্রাদেশিক লাটগণের উপর নির্ভর করিত। অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ের ন্যায় আয়-ব্যয় নির্ধারণ ব্যাপারে ব্যবস্থা-পরিষদের কোন হাত ছিল না।

ব্যবস্থা পরিষদ ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণের শক্তিহীনতা।

১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড কৃত শাসন সংস্কার আইন মূলে এই অবস্থার বাহ্যতঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণের উল্লেখযোগ্য কোনরূপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগই পরিষদের সদস্যগণের ভোটাধিকারের বহির্ভূত ছিল। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ক্ষেত্রে ভোটের বহির্ভূত ব্যয়ের ভাগ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম ছিল বটে; কিন্তু যে সব ব্যয় সম্পর্কে সদস্যগণের ভোট দিবার অধিকার ছিল, সেই সম্পর্কেও তাহাদের ভোট অনুযায়ী কার্য হওয়া-না-হওয়া বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। অসঙ্গত ও বাহুল্য হিসাবে কোন ব্যয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ না-মঞ্জুর করিলে কিম্বা হ্রাস করিলে বড়লাট কিম্বা প্রাদেশিক লাট তাহা অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া সম্পূর্ণ ব্যয় পাস করিয়া লইতে পারিতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মূলে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলা যায় না। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বেলায় এখনও শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় পারিষদের সদস্যগণের ভোটের অধিকারের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে বড়লাট আইন-প্রণয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থা তাহার নিজ ইচ্ছানুযায়ী

করিতে পারিবেন। সদস্যগণের অধিকারের অন্তর্গত যে সব ব্যয় তদ্বিষয়েও বড় লাটের অভিপ্রায় সদস্যদের বিরুদ্ধ-মত ও ভোটের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বেলায় সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগের পার্থক্য ১৯৩৫ সালের আইনে তুলিয়া দেওয়া হইলেও, লাট সাহেবের বেতন ও ভাতা, তাঁহার আফিস সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ, সরকারি খরচ, সরকারি ঋণ ও তাহার সুদ, মন্ত্রী, এড্‌ভোকেট জেনারেল, হাই-কোর্টের জজ প্রভৃতির বেতন ও ভাতা, শ্বেতাঙ্গদের (এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহ) শিক্ষা-ব্যয় এবং আইন-বহির্ভূত এলাকার (excluded areas-এর) ব্যয় এখনো ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণের অধিকারের বাহিরে রহিয়াছে। অন্যান্য প্রাদেশিক ব্যয় সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ভোটাধিকার থাকিলেও তাহাদের ভোটের মূল্য দেওয়া-না-দেওয়া প্রাদেশিক লাটের ইচ্ছার উপর অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করিবে। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ একমত হইলেও লাটের অমতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনহিতকর কোন ব্যয়ও করা চলিবে না। পক্ষান্তরে প্রাদেশিক লাট দেশের প্রতিবাদ ও জন-প্রতিনিধিদের আপত্তি সত্ত্বেও যে কোন প্রকার ব্যয় মঞ্জুর করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন সময়ে শাসন সংক্রান্ত আইনের বহিরাকৃতির অদলবদল ও পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, প্রকৃত ক্ষমতার ভার-কেন্দ্র হেলিয়া দুলিয়া প্রায় এক জায়গাতেই থাকিয়া যাইতেছে। খুঁটা ঠিকই আছে, ঘাস খাইবার রজ্জু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে মাত্র।

এক্ষণে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের সহিত বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম দিকে তাহাদের শাসিত বিভিন্ন প্রদেশগুলি স্ব স্ব প্রধান ছিল ও আর্থিক ব্যাপারে একের সহিত অন্যের

বিশেষ সংশ্রব ছিল না। সুতরাং আয়-ব্যয় সম্পর্কেও নিজেদের এলাকা মধ্যে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের অসুবিধা, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অভাব ইত্যাদি কারণেই কোম্পানী শাসিত তৎ-কালীন প্রদেশ সমূহের আয়-ব্যয়ের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ ১৭৭৬ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট আমলে আসার পর হইতে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার অর্থ-ব্যয় করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়। ইহার ফলে আয়-ব্যয় সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় সম্পর্কে অনবধানতা, অনাচার ও অপব্যয়ের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় একশত বৎসর পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মধ্যে আয়-ব্যয় কি ভাবে ভাগ হইবে তদ্বিষয়ে একটি নিয়ম প্রণয়ন করেন। তাহার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিস, জেলখানা, রেজিষ্ট্রেশন এবং রাস্তা ও ইমারত বিভাগের আর্থিক দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত হয় এবং এই সব বিভাগ হইতে উৎপন্ন আয় ব্যতীত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি (contribution) দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন অনুযায়ী এই ব্যবস্থা না হওয়ায় উল্লিখিত হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনায় অর্থাভাব ও আনুসঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটনের শাসন কালে এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে নিম্ন-লিখিত বিভাগগুলির পরিচালনার ভারও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পণ করা হয়। যথা, ভূমি-রাজস্ব, আবগারী, ষ্ট্যাম্প, আইন ও বিচার-এবং সাধারণ শাসন বিভাগ। পূর্বের বার্ষিক বৃত্তি বজায় রাখিয়া বাণিজ্য ও উৎপাদন শুল্ক, ষ্ট্যাম্প, আইন ও

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আয়-ব্যয় বণ্টন।

বিচার বিভাগ এবং লাইসেন্স ট্যাক্স হইতে আয়ের একটা অংশও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের পৃথকীকরণ সম্পর্কে আরও খানিকটা অগ্রসর হন। বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি সাকুল্য আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। অহিফেন, লবণ, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির আয় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া নির্ধারিত হয়। অন্য কতকগুলি আয়, যথা—দেওয়ানী, প্রাদেশিক পূর্ত ও পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের আয় এবং প্রাদেশিক রেইটস্, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হয়। আবকারি, ষ্ট্যাম্প, বন, রেজিষ্ট্রেশন ও ট্যাক্সের আয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট একটা নির্দিষ্ট হারে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া স্থির হয়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন এই ব্যবস্থাকে এক প্রকার পাকাভাবে স্বীকার করিয়া লন এবং প্রদেশগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী 'ডোল' বা বৃত্তি দিবার নিয়মও পুনঃ প্রবর্তিত করেন। ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড বিধানে উল্লিখিত নীতিকে পুনরায় ঢালিয়া সাজা হয়। ইহার ফলে উপরি উল্লিখিত তিনটি ভাগের পরিবর্তে ভারতীয় রাজস্বকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, আয়কর, লবণ কর, অহিফেন, রেলওয়ে, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস্ ও সৈন্য বিভাগের আয় সম্পূর্ণ ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য এবং ভূমি-রাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন, আবকারি, পূর্ত ও বন বিভাগের আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া স্থির হয়।

জাতি-গঠনমূলক কর্তব্যের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর রহিল; কিন্তু এই গুরু কর্তব্য পালন করিবার জন্য তাহার হাতে যে অর্থ তুলিয়া দেওয়া হইল তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। অন্যদিকে মোট রাজস্বের সারাংশই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষার নামে ব্যয়বহুল সৈন্য বিভাগের জন্য নিজে

গ্রহণ করিলেন। ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অনুমিত আয় শতকরা মাত্র ৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই সময় মধ্যে প্রাদেশিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২২ ভাগ। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ব্যয়বহুল শাসন বিভাগের জন্য। ফলে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির মোট বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ২৩ কোটী টাকার উর্ধে এবং অর্থাভাবে সর্বসাধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও হিতকর কার্যের সূচনা সুদূর পরাহত রহিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৩ সালে ১০ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় ৩৪।০ কোটী টাকা (১৯২১-২২ সাল) হইতে ৫৪ কোটী টাকায় (১৯৩৫-৩৬ সাল) দাঁড়াইয়াছে। ঐ সময় মধ্যে লবণ-করের আয় ৬।০ কোটী টাকা হইতে ৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আয়-কর হইতেও ভারত গবর্ণমেণ্ট তিন কোটী টাকা বেশী পাইয়াছেন। একদিকে ভারত গবর্ণমেণ্টের এরূপ আপেক্ষিক আর্থিক সচ্ছলতা ও আনুসঙ্গিক অপব্যয়, অন্যদিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একটানা অর্থাভাব ও চারিদিকে দেশবাসীর অসহায় অবস্থা।

রাজস্বের সারাংশ
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অসচ্ছলতা—জাতি গঠনে অর্থাভাব

তারপর আসিয়াছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বাণী লইয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন। এই আইনমূলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আর্থিক বিধিব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার ভার অর্পিত হয় স্যার অটো নিমেয়ার নামক জনৈক ইংরেজ বিশেষজ্ঞের উপর। তিনি যে রায় প্রদান করিয়াছেন তাহার ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ভাগ্যে যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিবে তাহার সম্ভাবনা অন্ততঃ অদূর

ভবিষ্যতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। নিমেয়ার রিপোর্টের সার কথা : সিন্ধুপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের বাজেট-ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ইহাদিগকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন ; পাটের রপ্তানি শুল্ক যাহার সম্পূর্ণ অংশ ভারত গবর্ণমেণ্ট এতকাল পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশ-সমূহের ন্যায্য আপত্তি উপেক্ষা করিয়া নিজে গ্রহণ করিতেছিলেন তাহার শতকরা ৬২॥ ভাগ এখন হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দিবেন ; এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আয়-কর হইতে একটা অংশ ভারত গবর্ণমেণ্ট এমনভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে বিতরণ করিবেন যাহাতে দশবৎসর পরে ইহারা উর্দ্ধকল্পে মোট আয়-করের অর্দ্ধেক পাইতে পারে।

বিগত দেড়শতাধিক বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বিলিব্যবস্থার যে-সব পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আজ পর্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আর্থিক প্রভুত্ব সামান্যই শিথিল হইতে দিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতি তাহাদের নিতান্ত প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্যগুলি পালন করিতে অক্ষম হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে অধিকতর ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিবার নীতি (policy of decentralisation) স্বীকার করিয়া লইলেও, এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে-সব রদবদল হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ফকিরের ভিক্ষা বলিলেও চলে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনমূলে নূতন প্রদেশ সৃষ্টি ও তাহাদের জন্য ব্যয়বহুল নূতন শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিতে একদিকে ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে অধিক সংখ্যক প্রদেশের মধ্যে বিভক্ত হইয়া আয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। নিমেয়ারের নির্দেশানুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদেশগুলিকে যে টাকা দিবেন তাহার দ্বারা অতিরিক্ত

শাসন ব্যয়ের বাজেট-ঘাটতিই শুধু পূরণ হইবে এবং উচ্চ বেতনভোগী আমলাতন্ত্রেরই পেট ভরিবে, দেশহিতকর কর্মানুষ্ঠানের সুবিধা অতি সামান্যই তাহা হইতে পাওয়া যাইবে মনে হয়।

অবশ্য এগার-বার বৎসর পরে স্যার অটো নিমেয়ারের রিপোর্টানুযায়ী আয়-কর হইতে ৩৸—৪ কোটী টাকা প্রদেশগুলির পাইবার সম্ভাবনা। পাট-শুল্ক বাবদ যে ৩৷৷ কোটী টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে পাট উৎপাদন-কারী প্রদেশগুলির (বঙ্গ, বিহার ও আসামের) ভাগ্যে ২২|২৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এগারটি প্রদেশের মধ্যে এই টাকা ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের ভাগে যাহা পড়িবে তাহার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য এবং তাহাও পাইতে বিলম্ব আছে। এদিকে সমস্ত জাতি, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, মনুষ্যত্বের সর্বপ্রকার সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া একটা বিরাট নিঃস্বতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। অথচ অন্যদিকে আমাদের চোখের সম্মুখে এক একটা জাতি অটুট সঙ্কল্প ও অমিত বিক্রমে যুগের পথ যেন এক এক পলে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

ভারতে সরকারী আয়

পূর্ব প্রবন্ধে আমরা ভারতের কর-নীতি ও সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে শাসক সম্প্রদায়ের সর্বময় কর্তৃত্ব, দেশীয় জনমতের অক্ষমতা, ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থা, জাতিগঠনমূলক কার্যে উপেক্ষা ও অবহেলা ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা আয়-ব্যয়ের হিসাব আপনাদের সম্মুখে ক্রমেক্রমে উপস্থিত করিয়া আমাদের উক্তি সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইব।

পণ্যশুল্ক

প্রথমে আয়ের দিকটা ধরা যাক্। আমরা অপর পৃষ্ঠায় আয়ের যে হিসাব দিতেছি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইয়া থাকে পণ্যশুল্ক (Customs) হইতে। ১৯২২ সালে ইহার পরিমাণ ছিল মোট আয়ের শতকরা ১৮·৫ ভাগ; ১৯৩৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫·৭ ভাগে দাঁড়ায়। চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই খাতে আমাদের আয় অতি সামান্য ছিল, এমন কি নগণ্য বলিলেও হয়। নিম্নে আমরা তাহার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব দিতেছি:

১৮৮২ সাল—২,৫৩,৯৬,১২০৲ টাকা

১৯০২ সাল—৫,৭৪,৯৫,২৮৫৲ টাকা

১৯১২ সাল—৯,৭০,২৮,৪৯৯৲ টাকা

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯১২ সালের পর পণ্যশুল্ক হইতে ভারতের আয় আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার কারণ বেশ রহস্যজনক মনে হইতে পারে। কিন্তু গূঢ় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিসন্ধিই ইহার প্রকৃত কারণ। ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধার

জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করেন। ইহার ফলে বিলাতী পণ্য বিনা শুল্কে ভারতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া আমাদের কুটীর-শিল্পের ধ্বংস সাধন ও তাহার বাজার দখল করিতে সক্ষম হয়। শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় কলে প্রস্তুত নূতন বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ সালে তাহার উপর উৎপাদন শুল্ক (excise duty) ধার্য করা হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোন কোন ক্ষেত্রে অতি নিম্ন হারে আমদানি শুল্ক প্রবর্তিত করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বব্যাপী লড়াই উপস্থিত হইবার পর তৎসংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কুলনের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষ বিদেশী পণ্যের উপর শতকরা ৭॥০ টাকা পর্যন্ত আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করিতে বাধ্য হন। তখন চা এবং পাটের উপর রপ্তানি শুল্কও নির্ধারিত হয়। ১৯১৭-১৮ সালের বাজেটে আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের হার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বর্ধিত করা হয়। তৎপর এরূপ শুল্কের হার ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই জন্যই ১৯১২ সালের ও ১৯২২ সালের পণ্যশুল্ক আয়ের মধ্যে এতটা আকস্মিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৈষম্য তৎপরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যুদ্ধের পর হইতে রীতিমত আমদানি শুল্ক ধার্য করিতে সুরু করেন এবং তাহারই ফলে এই খাতে বহু কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি পায়। গবর্ণমেণ্ট যদি পূর্ব হইতে এই নীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে এই প্রভূত আয়ের সাহায্যে একদিকে যেমন ভারতের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কার্যের জন্য চিরস্থায়ী অর্থাভাব অনেকটা দূর হইত, অন্য-দিকে তেমনি বিলাতী পণ্য অবারিত দ্বার পাইয়া অব্যাহত গতিতে আমাদের দেশের শিল্প এভাবে ধ্বংস করিতে পারিত না। এক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট

বিদেশী পণ্যের উপর যে সংরক্ষণ শুল্ক * আরোপ করিতেছেন তাহার মধ্যে নিজেদের স্বার্থও বেশ খানিকটা রহিয়াছে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের পর প্রভূত বিলাতী মূলধন দ্বারা ইংরেজগণ এদেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে; সুতরাং সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা ইংরেজ বণিকগণেরও সমভাবে প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী পণ্যের উপর যে হারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ হারে শুল্ক নির্ধারিত করা হইয়াছে অন্যান্য দেশ হইতে আনীত পণ্যের উপর। এইভাবে শাখের করাতের মত উভয় দিকে ইংরেজদের সুবিধা অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কিন্তু এইরূপ নীতির ফল আমাদের পক্ষে মোটেই শুভ হয় নাই। আমদানি শুল্ক ও অটোয়া চুক্তি দ্বারা এইরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে অন্যান্য দেশের নিকট আমরা বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছি এবং ইহারা পূর্বে আমাদের দেশ হইতে যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিত তাহা বহু পরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ ভারতের মোট রপ্তানির বেশীর ভাগই গ্রহণ করে এই সব দেশ। ইংলণ্ড গ্রহণ করে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। ইংরেজকে আমরা যে বিশেষ সুবিধা দান করিতেছি তদ্বিনিময়ে তাহারা যদি আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলেও একটা সান্ত্বনার কারণ থাকিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে সুবিধালাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। ১৯৩২ সালে অটোয়া চুক্তি সংসাধিত হইবার পর চারি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বিলাতী পণ্যের আমদানি শতকরা ৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পায় মাত্র শতকরা দশ ভাগ।

* বিশেষ কোন দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণার্থ বিদেশ হইতে আমদানি ঐ পণ্যের উপর নির্ধারিত আমদানি শুল্ক—যথা, বিদেশী চিনি ও লৌহের উপর নির্ধারিত শুল্ক।

আমদানি শুল্ক রাজস্বের ঘাটতি পূরণের জন্যই প্রধানতঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল ; দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ফলে দরিদ্র ভারতবাসীকে পণ্যশুল্কস্বরূপ পরোক্ষ করের দরুণ অধিক মূল্য দিয়া বিদেশী, প্রধানতঃ বিলাতী, পণ্য ক্রয় করিতে হইয়াছে ; অথচ ইহার বিনিময়ে দেশীয় শিল্পের উন্নতিলাভেরও বিশেষ সহায়তা হয় নাই। অবশ্য ১৯২৪ সালের পর ইস্পাত, শর্করা, দেশলাই, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি শিল্পের সংরক্ষণার্থ আমদানি শুল্ক প্রবর্তিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার ফল ভারতবাসীদের পক্ষে ভোগ করা সহজসাধ্য হইতেছে না। কারণ বিগত যুদ্ধের পর হইতে এত অধিক পরিমাণে বিদেশী ও বিলাতী মূলধন ভারতে নানাবিধ শিল্পে নিয়োজিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। লিভার ব্রাদার্স, ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল্‌স্, বাটা, সুইডিস ম্যাচ ফ্যাক্টরী, ডানলপ কোম্পানীর ন্যায় বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই প্রতিযোগিতার অসমতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। উপরন্তু সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত নীতির ফলে বিলাতী পণ্যের উপর শুল্কের হার হ্রাস করিয়া দেওয়ায় দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ আরও কঠিন হইয়াছে। মোটের উপর, আমদানি শুল্ক পরোক্ষ কর হিসাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দরিদ্র দেশবাসীর যতটা কর ভার বৃদ্ধি করিয়াছে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে ততটা সাহায্য করে নাই। অধিকন্তু আমদানি শুল্ক হইতে যে বিরাট রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে তাহার অতি সামান্য অংশই দেশের ধনোৎপাদনে বা জনহিতকর কর্মে ব্যয়িত হয়। ব্যয় সম্পর্কে আমরা যখন বিস্তারিত আলোচনা করিব তখন ইহার পরিচয় আরও ভালরূপে পাওয়া যাইবে।

১৯৩৫-৩৬ সালে পণ্যশুল্ক হইতে আমাদের যে মোট আয় হইয়াছে তাহার শতকরা ৬৮ ভাগ আমদানি শুল্ক, ৭ ভাগ রপ্তানি শুল্ক এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ উৎপাদন শুল্ক হইতে। বেশীর ভাগ আমদানি শুল্ক নিম্ন লিখিত পণ্যগুলি হইতে আদায় হইয়াছে—যথা, স্পিরিট, মদ, তামাক, কেরোসিন, সাইকেল, মোটরগাড়ী, লরী, যন্ত্রপাতি, ধাতুদ্রব্য, সূতা, সৌখিন ছিট, চিনি, ও কৃত্রিম রেশম। দেশীয় স্পিরিট, কেরোসিন, রৌপ্য, চিনি, দেশলাই, লৌহ ও ইস্পাতের উপর নির্ধারিত উৎপাদন শুল্ক হইতে প্রাপ্ত আয়কেও কাষ্টম্‌স্‌-এর মধ্যে ধরা হইয়াছে।

পণ্যশুল্কের পরই ভূমি-রাজস্ব হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইয়া থাকে। এই আয় ক্রমশঃ কি প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে:

১৮৬০-৬১—২১ কোটী টাকা
১৯০০-০১—২৬ „ „
১৯২০-২১—৩২ „ „
১৯৩৫-৩৬—৩২ „ „

এই ভূমি-রাজস্বের অধিকাংশই দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষিজীবীদের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। ভারতের এই কৃষক-সম্প্রদায়ের ন্যায় নিঃসহায় ও সর্বপ্রকারে বঞ্চিত মানবগোষ্ঠী জগতে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। দীনতা ও মূঢ়তার এমনি শেষ সীমান্তে ইহারা বাস করে যে, আধুনিক কালোপযোগী সুখস্বচ্ছন্দতার মুখদর্শন ত দূরের কথা, মনুষ্যজনোচিত জীবন-যাত্রা কাহাকে বলে তাহা ইহারা জানে না। সর্বাঙ্গীন রিক্ততার মাঝে কোন প্রকারে জীবনটাকে বহিয়া বেড়ান এবং কোন একটা মহামারীর আগমনে নীরবে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়া ইহাদের বিধিলিপি। সম্বল ইহাদের প্রত্যেকের ভাগে সামান্য ২।৪ বিঘা জমি, দু'হাজার বৎসরের পুরাতন

একটি লাঙ্গল বা সামান্য কাষ্ঠ ফলাকা ও এক জোড়া কৃশকায় বৃষ। চির-সাথী ইহাদের ঋণ। তদুপরি প্রকৃতির শুভদৃষ্টি—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহাদের উপরই কর-ভার আয়ের তুলনায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। এ দেশের অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায়ও ইহাদের প্রতি অধিকতর অবিচার করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আয়-কর (income tax)-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমি-আয় ভিন্ন অন্যান্য সর্বপ্রকার আয়ের উপর এই কর নির্ধারিত হয় এবং বার্ষিক দুই হাজার টাকার ন্যূন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই কর হইতে রেহাই দেওয়া হয়। দু'হাজার টাকার উর্ধে যাহাদের আয় তাহাদের মধ্যে যাহার আয় যত অধিক ,তাহাকে তত উচ্চহারে কর দিতে হয় কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে দরিদ্র কৃষককে তাহার দুই বিঘা জমির ২০৲।২৫৲ টাকা আয়ের জন্যও বার্ষিক ৪৲।৫৲ খাজানা বা ভূমিকর দিতে হয়। নিরিখের বেলায় এক হাজার বিঘা জমির মালিককে যে হারে খাজানা দিতে হয়, দুই বিঘার জমির মালিককেও এক প্রকার জমির জন্য সেই এক হারেই খাজানা দিতে হয়। চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে কোন বৎসর দুই হাজার টাকার ন্যূন আয় হইলে আমরা আয়-করের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারি ; কিন্তু কৃষকের একমাত্র সম্বল দুই বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইয়া তাহার সকল আশা নির্মূল হইলেও রাজস্ব বা খাজানার হাত হইতে রেহাই পাওয়া একপ্রকার অভাবনীয় ব্যাপার। ইহার দৃষ্টান্ত চম্পারণ বারদৌলির ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়ে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৯২৯ সালের পর যে বিষম মন্দা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য প্রায় অর্ধেক হ্রাস পাইয়াছে। দেবতা যখন এ ভাবে বিমুখ তখনও আমরা দেখিতে পাই যে ভূমিরাজস্ব হইতে সরকারী আয় অতি সামান্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ; বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থায়ও খাজানা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে আমাদের আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

তাহা এই যে, জমিদার, তালুকদার কিম্বা মাল-গুজারদারগণ সরকারী রাজস্ব ও সরঞ্জামী খরচ বাদে কৃষকের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজনার দরুণ যে প্রচুর টাকা মুনাফা পাইয়া থাকেন তাহার জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ কর দিতে হয় না। দু'চার হাজার হইতে লক্ষাধিক টাকার নিট লাভ এভাবে আয়-কর বা সর্বপ্রকার কর হইতে রেহাই পাইয়া যাইতেছে—অথচ এই বিপুল আয় অনেকটা অনুপার্জিত ও অনায়াসলব্ধ। ইহা অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ নিজেদের স্বার্থ ও প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্যই ভারতবর্ষে * এইরূপ একটি অনুগৃহীত, পোষ্য, ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের জমিদারগণ বার্ষিক চার কোটী টাকা রাজস্ব দিয়া প্রায় আঠার কোটী টাকা দরিদ্র কৃষককুল হইতে খাজানা বাবদ পাইয়া থাকেন। ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা যতই থাকুক না কেন, কালের ও অবস্থার পরিবর্তনে এইরূপ বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও সমর্থন করা সুকঠিন। তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলার প্রজা-আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা বিশেষভাবে দূষিত। অবশ্য ইহার মধ্যে উদার মতাবলম্বী আদর্শবাদী একটি বিশিষ্ট শ্রেণী রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কুকার্যে অজ্ঞাতে ইন্ধনই যোগাইতেছে। বাংলার ভূমি-বন্দোবস্ত সমস্যার পুনর্বিচারে যেরূপ ধীরতা, স্থিরতা ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে, সকল দিক হইতেই তাহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের ইহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, রাম, শ্যাম, রহিমের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া নিলেই যদু, মধু, করিমের অবস্থা আপনা হইতেই ভাল হইয়া যাইবে না—যদি না গবর্ণমেণ্ট তাহার অতিরিক্ত আয়ের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।

* বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং আরও কতকগুলি স্থানে।

তাহার জন্য চাই গভীর জ্ঞান, উদার দূরদৃষ্টি ও অনমনীয় কর্মক্ষমতা। জাতি-গঠন-মূলক কার্যে আমাদের সে যোগ্যতা কোথায়?

আয়-কর (income tax) ভূমি-করের ন্যায় প্রত্যক্ষ-কর (direct tax)-এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমাদের দেশের ভূমি-কর প্রতিগামী ও প্রতিক্রিয়াশীল (Regressive) এবং কর-নীতির আধুনিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কৃষকের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী খাজানার হারের কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না—বড় ও ছোট, ধনী ও দরিদ্র, সকল কৃষককে এক শ্রেণীর জমির জন্য একই হারে খাজানা দিতে হয়। আয়করের বেলা অবশ্য অগ্রগামী নীতি (principle of progressive taxation) অনুসরণ করা হইয়া থাকে এবং আয়ের তারতম্য অনুযায়ী করের হার কম-বেশী হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও উচ্চতর আয়ের জন্য করের হার যতটা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় ততটা বেশী নহে। সেইজন্যই এইরূপ বিরাট দেশ হইতে আয়-কর বাবদ যে টাকা পাওয়া আমাদের সঙ্গত, তাহা আমরা পাই না এবং এই বাবদ আমাদের আয় মোট রাজস্বের শতকরা আট ভাগ মাত্র।

১৮৬০ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য আয়-কর প্রবর্তিত হয়। তৎপর ব্যবসায়ী ও চাকুর্যাদের উপর লাইসেন্স ট্যাক্স, সার্টিফিকেট ট্যাক্স প্রভৃতি নামে আয়-কর জাতীয় একপ্রকার কর ধার্য হয় এবং মাঝে মাঝে তাহা পরিত্যক্তও হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যয় সঙ্কুলনের জন্যই প্রধানতঃ এই করের আশ্রয় লওয়া হইত। ১৮৬২ হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আয়-কর হইতে নিম্ন পক্ষে দুই কোটী, উর্ধ পক্ষে তিন কোটী টাকা পাওয়া গিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর অতিরিক্ত লাভের উপর সুপার ট্যাক্স ও সারচার্জ ধার্য করার ফলে ১৯২২ সালে এই বাবদে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় একেবারে বাইশ কোটীতে আসিয়া দাঁড়ায়! তৎপর পুনরায়

ইহা হ্রাস পাইয়া বিগত দশ বৎসর যাবৎ সতের কোটী টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ড ও অন্যান্য ধনী দেশের তুলনায় আয়-করের হার এ দেশে কম হইলেও, ঐ সব দেশের মাথা পিছু আয়ের সহিত আমাদের আয়ের তুলনা করিলে আমাদের করের হার মোটেই কম নহে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে ধনীদের উচ্চতর আয়ের বেলায় আমাদের হার বিদেশের হারের তুলনায় অনেক কম। ফলে এ দেশে ধনীর তুলনায় নির্ধনের উপর করের চাপ বেশী পড়িতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আয়-কর সংশোধনমূলক যে নূতন আইনটী সম্প্রতি পাস হইয়াছে তাহার দ্বারা এই অবস্থার কিঞ্চিৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন আইন মূলে যাহাদের বার্ষিক আয় আট হাজার টাকার অনধিক তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কম আয়-কর দিতে হইবে; যাহাদের আয় আট হইতে চব্বিশ হাজারের মধ্যে তাহাদের কতককে বেশী ও কতককে কম আয়-কর দিতে হইবে। চব্বিশ হাজারের ঊর্ধে সকলকেই পূর্বের তুলনায় উচ্চতর হারে আয়-কর দিতে হইবে। ইহার ফলে এক দিকে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের আয়-কর হ্রাস পাইবে, অন্য দিকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ধনী ব্যক্তির কর বৃদ্ধি পাইবে এবং মোটের উপর ভারত সরকারের আয় এই বাবদে আরও দুই কোটী টাকার মত বেশী হইবে।

কিন্তু অতীতের একটি গুরুতর অন্যায়ের প্রতিকার বর্তমান সংশোধিত আইন দ্বারাও কিছুতেই সম্ভবপর হইল না। যে সব ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে তাহাদিগকে আয়কর দিতে হয় না—নিজ দেশে শুধু তাহাদের কর দিলেই চলে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর গড়ে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা ভারতের ক্ষতি হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার অনুকূলে অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে,

ভারতীয় কোম্পানীও যদি ইংলণ্ডে ব্যবসা করিয়া লাভবান হয় তবে তাহারাও বিলাতী আইন অনুসারে কিছু কর রেহাই পাইবে। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইংলণ্ডে বা ইউরোপে যাইয়া দেশের অর্থ ব্যয় করা ভিন্ন সেখান হইতে অর্থ উপায় করিয়া আনা কার্যতঃ কতটা ঘটিয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ভারতীয় ব্যবসায়িগণ বিলাতে কাজকর্ম করিয়া কর বাবদ যে অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন তাহার পরিমাণ বার্ষিক তিন চারি লক্ষ টাকা মাত্র। এই সামান্য টাকা বাঁচাইবার জন্য প্রতি বৎসর গড় পরতা এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করা ভারতের দিক দিয়া কত বড় ক্ষতি তাহা সহজেই অনুমেয়। এই টাকাটা পাওয়া গেলে স্যার অটো নিমেয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রদেশগুলি ইহার একটা প্রধান অংশ লাভ করিতে পারিত এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির চিরন্তন আর্থিক সমস্যার সমাধানের একটা সুরাহা হইতে পারিত।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ইংরেজ বণিকগণ ভারতে যে সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ড ভিন্ন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর কোন দেশে তাহারা এই সুবিধা পান না। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড বিরল-বসতি ইংরেজ উপনিবেশ—বৃটিশ মূলধনের উপর নির্ভর না করিয়া চলিবার উপায় তাহাদের একেবারেই নাই। সুতরাং তাহাদের সহিত ভারতের তুলনা এই ক্ষেত্রে চলিতে পারে না।

অধিকন্তু প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতিই আমাদের একমাত্র ক্ষতি নহে। ইহার আরো একটা গুরুতর দিক রহিয়াছে। ভারতীয় শিশু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি তাহাদের লাভের উপর উচ্চ হারে ইনকামট্যাক্স ও সুপারট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হয়, আর ভারতে অবস্থিত বিদেশী কিংবা বৃটিশ কোম্পানীগুলি তাহা হইতে রেহাই পায়, তাহা হইলে উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির টিকিয়া থাকা স্বতঃই বহুগুণ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আমরা

প্রতি বৎসর এই বাবদ যে প্রায় দেড় কোটী টাকা ক্ষতি দিয়া থাকি তাহা প্রকারান্তরে বিদেশী কোম্পানীকে সাহায্য বা বৃত্তি দান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে! শিল্প-প্রয়াসে নূতন ব্রতী ভারতীয়দের পক্ষে ইহা অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। বিদেশীরা তাহাদের মূলধন দ্বারা এই দেশে ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি ভারতীয় কোম্পানী আইনের কর্তৃত্বাধীনে আসিতে স্বীকৃত হইত কিংবা ভারতীয় কারবারে কেবল সুদে টাকা খাটাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিত তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। ইচ্ছা করিলে তাহারা এখনো তাহাদের স্বদেশে রেজেষ্টারীকৃত ব্যবসার জন্য এদেশে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইতে পারে। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ তাহারা দুধও খাইবে, তামাকও খাইবে। তাই নূতন আইন হইতে এই সম্পর্কীয় ৫৩ ধারাটী তুলিয়া দিবার জন্য ভারতীয় জনমত ও পরিষদের সদস্যগণ সমস্বরে আপত্তি উত্থাপন করিলেও তাহা টিকে নাই—বড়লাট সাহেব তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার বলে এইরূপ সংশোধন প্রস্তাব ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিবার অনুমতিই প্রদান করেন নাই! আত্ম-কল্যাণ নিয়ন্ত্রণে দেশবাসী আজ পর্যন্ত কতটুকু আত্ম-কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে ইহা তাহারই আর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবকারি

দেশী ও বিলাতী মদ ও স্পিরিট, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস ও ভাঙ্গ প্রভৃতির উপর নির্ধারিত শুল্ক এবং তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি হইতে এই টাকা আদায় হয়। গবর্ণমেণ্ট যে সব মাদকদ্রব্য নিজেদের ভাটি বা কারখানায় প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহার লাভও এই আয়ের অন্তর্গত। এই আয় এখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। ইহার প্রধান অংশ দেশীয় মদ ও স্পিরিট হইতে আসে। বিদেশী মদ ও স্পিরিট হইতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ বেশী নহে। আবগারী আয় কিরূপ নিয়মিতভাবে বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৬১-৬২ সালে—১,৭৮,৬১,৫৭০৲ টাকা

১৮৮১-৮২ সালে—৩,৪২,৭২,৭৪০৲ টাকা

১৯০১-০২ সালে—৬,১১,৫০,২১৫৲ টাকা

১৯২১-২২ সালে—১৭,১৮,৬১,৯১৪৲ টাকা

১৯৩৫-৩৬ সালে—১৫,২৬, ২৪,৩৮০৲ টাকা

এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে আমদানি ও উৎপাদন শুল্কের অত্যধিক বৃদ্ধি এবং ইহা আদায় সম্পর্কে সাতিশয় সতর্কতা। এই দ্রুত বর্ধমান আবগারী কর নেশাসেবীদিগকেই বহন করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই দরিদ্র। সুতরাং পরোক্ষ কর হিসাবে ইহার চাপ প্রধানতঃ দরিদ্র লোকের উপর যাইয়াই পড়ে। অবশ্য ইহার সমর্থনে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, শুল্কের হার এই ভাবে বৃদ্ধি করিয়া না দিলে দেশের মধ্যে পানদোষ ও অন্যান্য নেশার অভ্যাস অধিকতর প্রসার লাভ করিত এবং দেশের অধিকতর নৈতিক স্বাস্থ্যহানি ঘটিত। এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, উচ্চ শুল্ক সত্ত্বেও দেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতের দরিদ্র অধিবাসীরা উচ্চ শুল্ক দিয়াও গবর্ণমেণ্টের এই আয় যোগাইতেছে। ইহার জন্য দেশের আর্থিক দুরবস্থা, জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে দেশবাসীর অজ্ঞতা ও নৈরাশ্য এবং সাধারণ নৈতিক আবহাওয়া কম দায়ী নহে। কিন্তু এইরূপ অবস্থার দরুণ গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বকেও অস্বীকার করা যায় না।

লবণ-শুল্ক

১৯২২-১৯৩৬ সালের মধ্যে লবণ-শুল্ক বাবদ ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় বার্ষিক ৬৷৷ কোটী হইতে ১০ কোটী টাকা পর্যন্ত হইয়াছে। ১৮৮৬ সাল হইতে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত লবণের উপর শুল্কের হার মণ করা ২৷৷০ টাকা ছিল। তৎপর বিগত ৩৫ বৎসরের মধ্যে এই হার কখন বাড়িয়া কখন কমিয়া ১৲ টাকা ও

২॥০ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। এই বিভাগের আয় প্রধানতঃ দেশীয় ও বিদেশীয় লবণের উপর নির্ধারিত উৎপাদন ও আমদানি শুল্ক ও গবর্ণমেণ্টের তৈয়ারী লবণ বিক্রয়ের লাভ হইতে হইয়া থাকে। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী লবণের উপর শুল্কের হার এক প্রকার ছিল। কিন্তু তাহার পর বিদেশী লবণের উপর শুল্কের হার মণ করা।৬ আনা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে ভারত সরকারের অর্থাভাব আংশিক পূরণ করিবার জন্যই এই অতিরিক্ত শুল্ক নির্ধারিত হইয়াছিল,—ভারতের লবণের ব্যবসার উপকারার্থ ইহা করা হয় নাই। সেই জন্যই ১৯৩৮ সালে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে এই অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লবণের ব্যাপারে ভারতবাসী দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। শুল্কের বিষয় পরে আলোচনা করিব; প্রথমতঃ লবণব্যবসার কথা ধরা যাক। অতীতে ভারতবাসী লবণ সম্পর্কে স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল। ভারতবর্ষের তিন দিকেই সমুদ্র। বাংলাও সমুদ্রকে কোলাকুলি করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রের মধ্য হইতেই দক্ষিণ বা নিম্ন বঙ্গের উদ্ভব। অতীত কালে বালাশোরের পশ্চিম হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলার তিনশত মাইল ব্যাপী সমুদ্র উপকূলে প্রায় সাত হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে বহু লবণের গোলা ছিল, যাহা হইতে ৩০।৩৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত। লবণ শিল্প হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত পূর্বে তাহা বাংলার জমিদারগণের পাওনা ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা নিজে গ্রহণ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলে ১৮৭৩ সালের মধ্যে বাংলার লবণ শিল্প একেবারে লুপ্ত হয় এবং কোম্পানীর দৌরাত্ম্যে যে সব জেলায় ও অঞ্চলে লবণ তৈরী হইত সে সব স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। তাই আজ আমরা লবণাম্বুরাশি-পরিবেষ্টিত হইয়াও পরমুখাপেক্ষী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৩১ সালে বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত হারে আমদানি শুল্ক নির্ধারণের ফলে অন্যান্য

প্রদেশ লবণ প্রস্তুত বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে ; কিন্তু বাংলা যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়িয়া রহিয়াছে।

১৯৩৬-৩৭ সালে ১৪৪ লক্ষ মণ লবণ বাংলায় আমদানি হয়। তন্মধ্যে ৭৫ লক্ষ মণ বিদেশ হইতে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে। সেই বৎসর ভারতে বিদেশী লবণের মোট আমদানি হইয়াছিল এক কোটী তিন লক্ষ মণের উপর। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বিদেশী লবণের শতকরা ৭৩ ভাগই বাংলায় আসিয়াছে এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ তাহাদের নিজ প্রয়োজন মিটাইয়াও তাহাদের উৎপন্ন লবণের কতকাংশ বাংলায় পাঠাইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ৯৮½ লক্ষ মণ লবণ এডেন ও অন্যান্য দেশ হইতে এবং ৪৯ লক্ষ মণ লবণ অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাংলায় আমদানি হইয়াছিল। এই লবণের মূল্য গড়ে প্রতিমণ সোয়া দুই টাকা ধরিলে প্রায় ৩৷৷০ কোটী টাকা প্রতি বৎসর বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে!

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথক হইবার পূর্বে ব্রহ্মদেশেও এডেনের লবণকে অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পৃথক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশে এডেন হইতে আমদানী লবণের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে এবং লবণ শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে যাহার ফলে দেড় বৎসরের মধ্যে সে দেশে লবণের উৎপাদন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মদেশও শীঘ্রই লবণ সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে আশা করা যায়। কিন্তু বাংলা কোথায়?

এক্ষণে আমরা লবণের উপর আরোপিত শুল্কের ফলাফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই লবণ করের বিরুদ্ধে ভারতের নেতৃবর্গ ব্যবস্থা পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে চিরদিন তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছেন, এই কারণে যে, ইহা গরীব ভারতবাসীর তুচ্ছ আহার্যবস্তুর অপরিহার্য শেষ

উপাদানটুকু পর্যন্ত তাহাদের নিকট দুর্লভ করিয়া তুলিবে। এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করা কঠিন নয়। লবণের উপর শুল্ক যখনই বৃদ্ধি করা হইয়াছে তখনই ইহার ন্যায় অপরিহার্য জিনিসের কাটতিও বিশেষ ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। পক্ষান্তরে শুল্কের হার হ্রাস করা হইলে ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯০৩ ও ১৯০৮ সালের মধ্যে শুল্কের হার হ্রাস করিয়া দেওয়া হইলে লবণের ব্যবহার শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দরিদ্রসাধারণের নুন-ভাত ও স্বাস্থ্যের উপর এই করের প্রভাব কতখানি ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। এক মণ লবণের মূল্য শুল্ক বাদ দিলে চার-ছয় আনার বেশী নহে; কিন্তু তাহারই উপর আমাদিগকে ২॥০ টাকা পর্যন্ত শুল্ক দিতে হয়। 'বোঝার উপর শাকের আটি' এতকাল ইহাই শুনিয়া আসা গিয়াছে; এক্ষণে 'শাকের আটির উপর বোঝা' কি জিনিস তাহার পরিচয় আমরা পাইতেছি।

ভারতে সরকারী আয় (২)

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা পণ্যশুল্ক, ভূমি-রাজস্ব, আয়-কর, আবকারী, লবণ-শুল্ক হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের আয় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান পরিচ্ছেদে অন্যান্য খাতে ভারত-সরকারের আয় সম্বন্ধে আমরা একে একে আলোচনা করিব।

ষ্ট্যাম্পস্

ষ্ট্যাম্প-রাজস্ব প্রধানতঃ জুডিশ্যাল ও নন্-জুডিশ্যাল এই দুই ভাগে বিভক্ত। দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রেভিনিউ আদালতে আর্জি, দরখাস্ত, ওকালতনামা ও অন্যান্য দলিলের উপর যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়, তাহা জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প নামে খ্যাত। আর দান, বিক্রয়, খত, চেক, রসিদ, এগ্রিমেণ্ট প্রভৃতি বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক দলিল-পত্রের জন্য যে ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে নন্-জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প বলা হয়। উভয়বিধ ষ্ট্যাম্পস্ হইতে প্রাপ্ত মোট প্রায় ১২ কোটী টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ জুডিশ্যাল অর্থাৎ আইন-আদালত সংক্রান্ত ষ্ট্যাম্প্স্ হইতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার শতকরা ৭০ ভাগ একশত টাকার ন্যূন মূল্যের মোকর্দমা হইতে আদায় হইয়া থাকে। ফৌজদারী মাম্লাতেও দরিদ্র লোকেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িত থাকে। সুতরাং ষ্ট্যাম্প-রাজস্বের বেশীর ভাগ পরোক্ষভাবে গরীবদের নিকট হইতেই আদায় হইয়া থাকে। ১৯১২ সালে ষ্ট্যাম্প্স্ হইতে মোট আয় ৭ কোটী টাকার অধিক হইয়াছিল। উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৫ সালে ১২ কোটী টাকার ঊর্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, বিগত ২৩ বৎসরের মধ্যে এই আয় শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ দেশের লোকের মত মাম্লাবাজ জাতি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের সমাজ-দেহ এই বিষে কিরূপ দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—যাহার চক্ষু আছে তিনিই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। শিক্ষাভাব, কর্মাভাব, সর্বোপরি কূপমণ্ডুকত্ব যে এই অবস্থার জন্য দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রেজিষ্ট্রেশন

দান, বিক্রয়, হস্তান্তর, রেহানি তমস্থক প্রভৃতি দলিল সম্পাদনের জন্য কেবল মাত্র ষ্ট্যাম্প দিলেই চলে না; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী এই সব দলিল সরকারী আফিসে রেজিষ্টারী করিতে হয় এবং তজ্জন্য সম্পত্তির মূল্যানুযায়ী একটা ফিস্ দিতে হয়। এই বিভাগের আয়ও বিগত ২৩।২৪ বৎসরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১২ সালে এই বিভাগ হইতে আয় হইয়াছিল ৬৩॥ লক্ষ টাকা। ১৯৩৫-৩৬ সালে আয় হইয়াছে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা। অনেকে মনে করেন মানুষের অবস্থা দিন দিন হীন হওয়ার ফলেই ভূসম্পত্তির দ্রুত হস্তান্তর ঘটিতেছে এবং ফলে এই আয় ঐরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আয়ের একটা বৃহৎ অংশ দরিদ্র সাধারণের নিকট হইতে আসিয়া থাকে।

বন-বিভাগ

বৃটিশ ভারতের মোট আয়তনের শতকরা ২২ ভাগই বিশাল অরণ্য-ছায়াচ্ছাদিত। ২,৪৯,৭১০ বর্গ মাইল জুড়িয়া এই অমূল্য সম্পদশালী নিবিড় বনরাজি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু দেশের একান্ত দুর্ভাগ্য, গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যে ও জনসাধারণের অক্ষমতার দরুণ আমরা ভগবদ্দত্ত এই অতুল নৈসর্গিক সম্পদকে একেবারেই কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। এক কোটী টাকার অধিক মূল্যের কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড এবং বহু সহস্র টন মণ্ড (pulp) প্রতি বৎসর আমরা বিদেশ হইতে আমদানি করি; অথচ ভারতের বনে-অরণ্যে যে বাঁশ ও ঘাস উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা

করিতে পারিলে দেশের এতগুলি টাকা দেশেই থাকিয়া যায়, অধিকন্তু আমরা বিদেশে কাগজ চালান করিতে পারি। শুধু তাহাই নয়, দেশলাই, রবার, রজন, লাক্ষা, তারপিন তৈল ও চন্দন তৈল প্রভৃতির সাহায্যে বহু শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে। তক্তা, জ্বালানী কাঠ, নানা জাতীয় পাতা, ফল, তন্তু, ঘাস, আঠা, রজন, বল্কল, জীবজন্তু এবং খনিজ সম্পদ ভারতের বনে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ইহারা বহুবিধ শিল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফলে তক্তা ও জ্বালানী কাঠ বিক্রয় ও বনগুলির সংরক্ষণ ভিন্ন দেশের ও দেশবাসীর কোন বৃহত্তর কল্যাণেই ইহা লাগিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে যাহারা যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই সব বনে ও অরণ্যে গোচারণ ও কাষ্ঠ আহরণ দ্বারা গোপালন ও জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিধি-নিষেধের ফলে তাহাদের এই চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতেছে। বন-বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় বিগত ৩৫।৩৬ বৎসরে দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০১ সালে এই বিভাগের আয় ছিল কিঞ্চিন্ন্যূন ২ কোটী টাকা। ১৯৩৬ সালে এই আয় দাঁড়াইয়াছে ৪। কোটী টাকারও উর্ধে। এই আয়ের অধিকাংশই তক্তা ও অন্যান্য কতকগুলি অরণ্যজাত জিনিসের বিক্রয়লব্ধ-অর্থ হইতে আসিয়া থাকে। পশু-চারণ, জ্বালানী-কাঠ, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য কতকগুলি জিনিস আহরণ করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য ব্যক্তিবিশেষের নিকট যে ফিস আদায় করা হয়, তাহা হইতেও একটা আয় হয়।

রেলওয়ে

১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ, বোম্বাই হইতে কল্যাণ এবং মাদ্রাজ হইতে আরকোনাম পর্যন্ত প্রাইভেট কোম্পানীর সহায়তায়

ভারতবর্ষে রেল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সিপাহী বিপ্লবের পর হইতে সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য এই দেশে ব্যাপক ভাবে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে বিলাতী কোম্পানীকে বার্ষিক শতকরা অন্যূন ৫৲ টাকা লাভ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ভারতে রেল-স্থাপনার জন্য আহ্বান করা হয়। রেল-লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় জমিও বিনা মূল্যে এই সব কোম্পানীকে দেওয়া হইবে, সর্ত করা হয়। যত ক্ষতিই হউক না কেন, তাহা যখন তৃতীয় পক্ষ পরিপূরণ করিয়া দিবে এবং তদুপরি গৌরী সেনের অর্থে অন্যূন শতকরা ৫৲ টাকা লাভও পাওয়া যাইবেই, তখন কোম্পানী-পরিচালনায় ব্যবসানুমোদিত নিপুণতা ও মিতব্যয়িতার কোনরূপ প্রয়োজন থাকে না। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সময় ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি দিবার একেবারেই আবশ্যকতা হয় নাই। ফলে অর্থের যতদূর সম্ভব অপব্যয় হইয়াছে এবং ভারতের অর্থে অপরের পকেট ভারী ও দেমাক বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিয়াছে। অবশ্য বৃটিশ শাসনের গুণরাশির কথা উঠিলে সর্বপ্রথমেই রেলওয়ের বিষয় উল্লেখ করা হইয়া থাকে। রেলওয়ে হইতে ভারতবাসী নিশ্চয়ই কিছু আনুসঙ্গিক সুবিধা পাইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য মূল্যও যাহা দিয়াছে তাহা সামান্য নহে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, পরাধীনতার বন্ধন আরও দৃঢ় করিবার জন্যই সারা ভারতের বুকে এই লৌহ-দণ্ড বিছান হইয়াছিল এবং ইহারই সাহায্যে ইংরেজের পণ্য ভারতের সহর বন্দর ছাইয়া ফেলিয়া দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, রেলওয়ের জন্য আবশ্যকীয় বহু মূল্যবান্ কোচ, ইঞ্জিন ও যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সব ইংলণ্ড হইতেই আসিয়াছে। ইহার মূল্য দিবার জন্য কোটী কোটী টাকা দেশত্যাগী হইয়াছে। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত রেল-কোম্পানীগুলি হইতে কোন প্রকার লাভ পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত সরকারকে প্রায় ৭৮ কোটী টাকা দিতে হইয়াছে। এইরূপ ক্ষতি বহন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ায়

১৯৮০ সালের পর যে সব বিলাতী রেল কোম্পানীর সহিত নূতন চুক্তি করা হয়, তাহাতে প্রতিশ্রুত লাভের হার হ্রাস করিয়া শতকরা ৩।৹ টাকা নির্ধারিত করা হয়। অধিকন্তু এইরূপ সর্ত করা হয় যে, রেলওয়ের পরিচালনার ভার কোম্পানীর উপর থাকিলেও উহার মালিকি স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের থাকিবে এবং পঁচিশ বৎসর পরে কিম্বা তৎপর প্রতি দশ বৎসর অন্তর ইহার সর্ত পরিবর্তন করা চলিবে। বর্তমানে কয়েকটি রেলওয়ে, যথা নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, ইষ্ট বেঙ্গল, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার ও বার্মা রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট মূল্য দিয়া নিজ কর্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বে বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল নাগপুর, সাউথ ইণ্ডিয়া, আসাম বেঙ্গল এবং মাদ্রাজ সাউথ মালাবার এই কয়টি লাইনের মালিক গবর্ণমেণ্ট, কিন্তু কোম্পানীর পরিচালনাধীন। বোম্বে এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, রোহিলখণ্ড কুমায়ন ও সাউদার্ণ পাঞ্জাব প্রভৃতি কয়েকটি লাইনের মালিক এখন পর্যন্ত প্রাইভেট কোম্পানী। ১৯০০ সাল পর্যন্ত মোট রেলওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল ২৪,৭১৩ মাইল; ১৯১৫ সালে ৩৫,২৮৫ মাইল। বর্তমান সময়ে ইহার পরিমাণ প্রায় ৪৩ হাজার মাইল। অবশ্য ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত রেলওয়ে ধরা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতীয় কোম্পানীগুলির মোট মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৮০০ শত কোটী টাকা। ১৯০১ সালের পর হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট রেল কোম্পানীগুলি হইতে লভ্যাংশ পাইতে সুরু করেন। কিন্তু ১৯৩১ সালের পর ব্যবসা মন্দার দরুণ ইহারা পুনরায় লোকসান দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই লোকসানের পরিমাণ প্রায় দশ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিলাত হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের জন্য যে টাকা ধার করিয়া আনিয়াছেন, তাহার জন্য একই ভাবে উচ্চ হারে সুদ দিয়া যাইতেছেন; তদুপরি দেনা বৃদ্ধির দরুণ সুদের মোট অঙ্কও বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত মূলধন হইতে আয়ের পরিমাণ মন্দার দরুণ বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় রেল কোম্পানীতে নিয়োজিত

বিলাতী মূলধনের নিরাপত্তা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারত ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন স্বজাতি-গঠিত কমিটির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। যাহাতে রেলওয়ে ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোনরূপ কর্তৃত্ব না থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত শাসন আইনেও পাকাপাকি ভাবেই করা হইয়াছে। ইহা হইতে ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

পূর্ত ও সেচবিভাগ

খাল কাটিয়া কিংবা নলকূপ বসাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কৃষিকার্যের জন্য শস্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে চাষের জন্য জলের আবশ্যকতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। পুরাকাল হইতে এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ব্যাপক বন্দোবস্ত থাকার বহু প্রমাণ আমরা পাই। পর্যটক বাউরি (Bowrey) পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে ও পর্যটক বার্ণিয়ার (Bernier) সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর ও গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য সেচখাল দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহা তাহারা তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিস্ময়ের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কার্ল মার্কস এই সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার লেখা (ভারতে ইংরেজ শাসন) হইতে কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"এশিয়ায় অতি প্রাচীনকাল হইতে তিনটী সরকারী বিভাগ চলিয়া আসিতেছে,—রাজস্ব, সৈন্য ও পূর্ত। খাল কাটিয়া জমিতে জল সেচন ব্যবস্থা প্রাচ্যদেশে কৃষিকর্মের প্রাণ-স্বরূপ। তাই প্রাচ্যের সকল শাসন-ব্যবস্থায় পূর্ত বা সেচ বিভাগ একটা প্রধান স্থান চিরদিন অধিকার করিয়া আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মদক্ষতার উপর ভূমির উর্বরতা নির্ভর করিত। জল

সেচন ও জল নিকাশ ব্যবস্থার অবহেলা দেশের কৃষিকর্মের সর্বনাশ সাধন করিত। এই কারণেই একটা মাত্র সর্বনাশী যুদ্ধের ফলে একটা সভ্যতার বিলোপ সাধিত হইত, দেশ বহুকাল জনহীন হইয়া থাকিত। এই কারণেই মিশর, পারস্য ও ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ এককালে কৃষিকর্মে খুব সমৃদ্ধিশালী হইলেও পরে অনুর্বর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে রাজস্ব ও যুদ্ধ বিভাগ গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কৃষি-কার্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। ফলে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য বা নির্বিরোধ নীতি ভারতে কৃষিশিল্পের প্রতি একেবারে দৃষ্টিপাত করে নাই এবং কৃষক ও কৃষিকর্মের নিদারুণ দুর্গতি ঘটিয়াছে।"

কৃষকের দুরবস্থার অর্থই সমস্ত দেশের দুরবস্থা। কারণ শতকরা ৮৫।৯৫ জনই ভারতের কৃষিজীবী। ইহাদের দুরবস্থা আজ এমন চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে যে, কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই আর তাহা উপেক্ষা করা চলে না তাই দেশের স্বাস্থ্য ও জমির উর্বরা শক্তির উন্নতি বিধানের জন্য কিছুকাল হইতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পূর্ত বিভাগের উপর পতিত হইয়াছে। নদীমেখলা বাংলার নদনদী, খালবিল, নানা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে শুকাইয়া যাওয়ায় তাহার একটা বৃহৎ অংশ, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের বহু জেলা, জনবিরল, জঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এতকাল বাংলার কর্তৃপক্ষ এই সমস্যাকে নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা আশা করি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধীনে আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে প্রতিকারের সূচনা দেখিতে পাইব।

আমরা নিম্নে একটি হিসাব দিতেছি—তাহা হইতে বিভিন্ন প্রদেশের সেচ ব্যবস্থার পরিমাণ ও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কতটা সামান্য তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রদেশ	মোট শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ (একরে)	সেচব্যবস্থাসম্পন্ন শস্য-ক্ষেত্রের পরিমাণ (একরে)	মোট শস্য-ক্ষেত্রের তুলনায় সেচপ্রাপ্ত জমির শতকরা হার
মাদ্রাজ	৩,৭৫,৩৯,০০০	৭৩,০২,০০০	১৯.৪
বোম্বাই-দাক্ষিণাত্য	২,৬৪,০৫,০০০	৩,৮৮,০০০	১.৪
সিন্ধু	৪১,৯২,০০০	৪০,৬৯,০০০	৯৭.১
বাংলা	২,৭৯,২১,০০০	১,৩০,০০০	০.৫
যুক্ত প্রদেশ	৩,৫০,৩৩,০০০	৩৮,২৭,০০০	১০.৯
পাঞ্জাব	২,৯৮,৩৩,০০০	১,০৪,৮৫,০০০	৩৫.১
ব্রহ্ম	১,৮১,৬৪,০০০	২০,৫৪,০০০	১১.৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২,৯৫,৪৭,০০০	৮,৫৩,০০০	২.৯
মধ্যপ্রদেশ (বেরার বাদে)	২,০৮,০৯,০০০	৩,২৩,০০০	১.৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৫,৫৫,০০০	৪,১০,০০০	১৬.০
রাজপুতনা	৪,৪৬,০০০	২৭,০০০	৫.৯
বেলুচিস্থান	৪,১০,০০০	২০,০০০	৫.০
মোট	২৩,২৮,৫৪,০০০	২,৯৮,৮৮,০০০	১২.৮

যাহারা নিজেদের শস্যক্ষেত্রের জন্য সরকারী সেচ বিভাগের খাল বা নলকূপ হইতে জলগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রতি বিঘা বা একর জমির জন্য একটা নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হয়। ইহাই এই বিভাগের প্রধান আয়। ভূমি-রাজস্বের একটা অংশও সেচ-বিভাগকে দেওয়া হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে গবর্ণমেন্টের মোট আয় ও নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা 'নিট' লাভ অবগত হওয়া যাইবে :—

বৎসর	খরচ বাদে মোট আদায়	মূলধনের উপর শতকরা লাভ— (গড়পরতা)
১৯০০-০১	২,৭৭,৭০,১৩৫৲ টাকা	৬.৫৫
১৯১০-১১	৩,৭৩,০২,২২৮৲ টাকা	৬.৩
১৯২০-২১	৫,৭৫,৭৮,৩৫৬৲ টাকা	৭.৩২
১৯৩২-৩৩	৮,৫৭,১২,৩০৮৲ টাকা	৫.৪৪

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্যবসা-মন্দার পর ১৯৩২-৩৩ সালে লাভের পরিমাণ শত করা ৬৲ টাকা অপেক্ষা কম হইয়া থাকিলেও অন্যান্য বৎসর এই লাভ সর্বদাই ৬৲ টাকার উর্ধে রহিয়াছে। বাজারে চলতি সুদের হার অপেক্ষা ইহা অধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯৩৩ সালের মত দুর্বৎসরেও এই লাভের পরিমাণ ৪৭৲ টাকা পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। মন্দার পূর্বে অনেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট সেচ-বিভাগে নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ২০৲, ৩০৲, ৪০৲ টাকা পর্যন্ত লাভ করিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে এই সেচ-বিভাগের কার্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :— লাভজনক (productive) ও সংরক্ষণমূলক (protective)। লাভজনক 'স্কিম' অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে কর্ম সমাপ্তির দশ বৎসরের মধ্যে ঐ স্কিমের চলতি খরচ ও মূলধনের উপর দেয় বার্ষিক সুদের টাকাটা যাহারা জল ব্যবহার করিবে তাহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের প্রধান স্কিমগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে সব অঞ্চল অনাবৃষ্টি কিংবা স্বল্প বৃষ্টির জন্য সাধারণতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে রক্ষা করা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কিমের উদ্দেশ্য। ইহাদের আয় হইতে খরচ ও সুদ সম্পূর্ণ পোষায় না এবং সেই জন্য 'ফ্যামিন রিলিফ এণ্ড ইনসিওরেন্স্ ফণ্ড' এর বরাদ্দ অর্থ হইতে এই শ্রেণীর স্কিমের জন্য সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ছোট ছোট স্কিম আছে যাহা হইতে কোন প্রকার আয়ের ব্যবস্থা নাই।

কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে সেচ ব্যবহারের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ করা বাহুল্য। যেখানে সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত বারিপাত সম্পূর্ণ দৈবাধীন, অথচ যে স্থলে ইহার উপরই শস্যোৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে (তদুপরি যেখানে কৃষিই অধিকাংশ লোকের একমাত্র নির্ভর স্থল) সেখানে শস্য রক্ষার জন্য জলের সুবন্দোবস্ত করা প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের সর্বপ্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। অতি পুরাকালেও রাজশক্তির এই বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা ছিল, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ বিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য ইংরেজ শাসনাধীনে বাস করিয়াও আমাদিগকে এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈবের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। নিজ প্রয়োজনে শাসনকর্তারা লাভক্ষতি বিবেচনা না করিয়া ভারতের স্কন্ধে বিশাল ব্যয়ভার চাপাইয়া ঝড়ের বেগে সারা দেশময় রেল লাইন ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন; কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর মুখের গ্রাসটুকু যাহাতে ধ্বংস না পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার বেলায় হিসাবের কষাকষি করিয়া অন্ততঃ শতকরা ৬৲ টাকা লাভ না পাইলে অর্থব্যয় করিয়া সেচ ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা দ্বিধাগ্রস্ত।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, সেচ-বিভাগের আয়ের অধিকাংশ ভূমি-রাজস্বের ন্যায় দরিদ্র কৃষককুলকে দিতে হয়। এবং ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে স্বল্প বা অধিক জমির মালিক সকলকেই একই হারে দিতে হয়। ইহা কর-নির্ধারণের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি (regressive principle)। বৎসরের ভালমন্দের উপর ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে না, ভূমি-রাজস্বের ন্যায় ইহা অপরিবর্তনীয়—আয়-করের ন্যায় ইহা প্রতি বৎসর অবস্থানুযায়ী পরিবর্তনশীল নহে। সেই জন্যই ১৯৩০ সালের পর শস্যের মূল্য অর্ধেকের অধিক হ্রাস প্রাপ্ত

হইলেও গবর্ণমেণ্টের লাভের হার তাহার তুলনায় অতি সামান্তই হ্রাস পাইয়াছিল। ৩৫ পৃষ্ঠায় ১৯৩২-৩৩ সালের হিসাব দ্রষ্টব্য।

সিভিল এড্‌মিনিষ্ট্রেশন

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিচার, জেল, পুলিশ, ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং, ইমারত বিভাগের আয় ইহার অন্তর্গত। এই আয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। মোট রাজস্বের শতকরা তিন ভাগ মাত্র। বিচার বিভাগের আয় আদালত কর্তৃক আদায়ী জরিমানা, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও মোকর্দমার ফি হইতে, জেল বিভাগের আয় কয়েদীগণ কর্তৃক জেলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়-মূল্য হইতে, শিক্ষা-বিভাগের আয় সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্র-বেতন হইতে, স্বাস্থ্য-বিভাগের আয় সিরাম ও ভ্যাক্‌সিন বিক্রয় হইতে, কৃষি-বিভাগের আয় সরকারী পরীক্ষা-মূলক আবাদের বীজ ও ফসলাদি বিক্রয় হইতে এবং কৃষি-শিক্ষালয় ও পশু-চিকিৎসালয়ের ফিস্ হইতে, ইমারত বিভাগের আয়—সরকারী বাড়ী-ঘরের ভাড়া, রাস্তা ও খেয়াঘাটের টোল এবং সরকারী কারখানার আয় হইতে, প্রিন্টিং বিভাগের আয়—গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদির বিক্রয় হইতে আসিয়া থাকে।

সরকারী দাদনের সুদ

ভারত-গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাহাদের প্রয়োজনে ঋণ দান করিয়া থাকেন। আবার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টও মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিকে সময় সময় তাহাদের অভিপ্রেত বিশেষ কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহার্থ টাকা ধার দিয়া থাকেন। এই সব ঋণের বাবদ যে সুদ পাওয়া যায় তাহাই এই বিভাগের আয়।

তপশীলভুক্ত কর (Scheduled Tax)

প্রমোদ কর, জুয়াখেলার কর, বিলাস কর (Luxury tax) ইহার অন্তর্গত। মুদ্রা ও টাকশাল, নোটের বিনিময়ে যে সিকিউরিটি রক্ষিত

হয় তাহার সুদ, নোট ছাপিবার ও টাকা তৈয়ারীর লাভও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

সৈন্য বিভাগ

পুরাতন ও অব্যবহার্য সাজসরঞ্জামাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব, জরুরী প্রয়োজনে অন্য দেশকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করার দরুণ প্রাপ্ত অর্থ ইহার অন্তর্গত।

ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ

এই বিভাগের আয় এত সামান্য যে ইহা ধর্তব্যের সামিল নহে। নিম্নোক্ত হিসাব হইতে এই বিভাগের পাঁচ বৎসরের লাভক্ষতি বুঝিতে পারা যাইবে :

বৎসর	মোট আয়	মোট ব্যয়
১৯৩০-৩১	১০,৭৭,৮৬ সহস্র টাকা	১২,১১,৩৫ সহস্র টাকা
১৯৩১-৩২	১০,৬৪,৫৯ ” ”	১১,৫৮,৪৪ ” ”
১৯৩২-৩৩	১০,৫৫,৪০ ” ”	১০,৯৭,৩০ ” ”
১৯৩৩-৩৪	১০,৭২,৬২ ” ”	১১,২৪,৫৫ ” ”
১৯৩৪-৩৫	১১,১৯,৮৭ ” ”	১০,৮১,৯৩ ” ”

সাধারণ মন্তব্য

আধুনিক করনীতির গোড়ার কথা হইতেছে এই যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিসদৃশ বৈষম্য সমাজে বিদ্যমান তাহা বিবেচনা করিয়া করভার বণ্টনের সময় দরিদ্রের উপর যাহাতে করের চাপ অধিক না পড়ে তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সেই জন্যই কর-শাস্ত্রে আধুনিক কালে ক্রমবর্ধমান নীতি (principle of progressive taxation) সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। তাহার অর্থ মোটামুটি এই যে, যাহার আয় যত বেশী হইবে তাহাকে তত অধিক হারে কর দিতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখিতে পাইয়াছি যে, এই নীতি সাধারণতঃ এদেশে অনুসৃত হয় নাই।

করের চাপ—তাহা প্রত্যক্ষ করই হউক, আর পরোক্ষ করই হউক—অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্রের উপরই আসিয়া পড়িয়াছে। আয়-কর ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে অগ্রগামী বা ক্রমবর্দ্ধমান নীতি অনুসৃত হয় নাই। এই ক্ষেত্রেও ইহা যতটা ক্ষিপ্র ও উগ্র হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ ধনীর উপর যতটা উচ্চ হারে কর নির্ধারিত হওয়া সঙ্গত ছিল, তাহা হয় নাই। ভূমি-রাজস্ব ও সেচ-কর প্রত্যক্ষ করের দুইটী প্রধান দৃষ্টান্ত। ইহাদের বেলায় প্রতিগামী বা প্রতিক্রিয়াশীল নীতি (principle of regressive taxation) অনুসরণ করা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই এক একরের মালিক ও এক হাজার একরের মালিক, এই উভয়কেই অবস্থা নির্বিশেষে একই হারে কর দিতে হইতেছে। আয়-করের বেলায় যেমন ২,০০০৲ টাকার অনধিক বার্ষিক আয়ের জন্য কোন কর দিতে হয় না, ক্ষুদ্র কৃষকের বেলায় কিন্তু তদ্রূপ কোন রকম অনুগ্রহ দেখান হয় না। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মোট রাজস্বের তুলনায় আমাদের ভূমি-রাজস্ব কত অধিক। ইংলণ্ডে ভূমি-রাজস্ব মোট রাজস্বের সহস্র ভাগের এক ভাগও নহে; ফ্রান্সে শতকরা দুই ভাগের কিছু বেশী। ইটালিতে শতকরা এক ভাগেরও কম; অথচ আমাদের দেশে ইহা মোট রাজস্বের ১৫ ভাগ! ইহার উত্তরে অবশ্য বলা হইতে পারে যে, শিল্প-ক্ষেত্রে ভারতের অনুন্নত অবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। রাজ্যশাসন করিতে হইলে রাজস্বের প্রয়োজন। শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহের যে বিপুল অর্থাগম হইয়া থাকে তাহার কোন অংশ যখন এ দেশের গবর্ণমেণ্টের পাইবার আশা নাই, তখন অনন্যোপায় হেতু তাহারা এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া আর কি করিতে পারেন? ইহার উত্তরে ভারতে শ্রমশিল্পের আজ এরূপ দুরবস্থা কেন হইল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের যে বিরাট আয় হইয়া থাকে—যে আয় মোট রাজস্বের শতকরা ২৫ ভাগ—তাহার মূলেও শিল্প-

ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কলঙ্ককর অনুন্নত অবস্থা গৌণভাবে সূচিত হইতেছে। বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের জন্য ইংলণ্ডের প্রয়োজন সস্তা কাঁচা মালের এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজন গম ও চালের—তাহাই ইংলণ্ড আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কাঁচা মালগুলি কারখানায় রূপান্তরিত করিয়া বহুগুণ অধিক মূল্যে নানারূপ বিলাস সামগ্রীরূপে ভারতবর্ষে পুনঃ প্রেরণ করে। সেই জন্যই ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের এত আধিক্য এবং তাহার উপর নির্ধারিত শুল্ক এত অধিক লাভজনক। বনবিভাগ হইতে যে আয় হইয়া থাকে, তাহাও প্রধানতঃ দরিদ্রের নিকট হইতেই আদায় হইয়া থাকে। পরোক্ষ করের মধ্যে লবণের উপর নির্ধারিত শুল্ক অন্যতম এবং ইহার আয়ও প্রচুর। এই করের হাত হইতে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিরও রেহাই পাইবার উপায় নাই, যেহেতু ইহা ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। জীবনধারণের পক্ষে ইহা যেমন অপরিহার্য তদনুপাতে ইহার মূল্য নিতান্ত নগণ্য। উচ্চ শুল্কের দরুণই ইহার যাহা কিছু মূল্য। দরিদ্র ভারতবাসীকে এই কর বহন করিতে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা আমরা সহরের সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতে পারি না। পৃথিবীর কোন ধনী দেশও লবণের উপর এতটা উচ্চ হারে শুল্ক নির্ধারণের কথা চিন্তা করিতে পারে না। ষ্ট্যাম্পস্, রেজিষ্ট্রেশন, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতিও প্রধানতঃ দরিদ্রের নিকট হইতেই আদায় হইয়া থাকে, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রেলের আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় হয়। মালের ভাড়া পরোক্ষভাবে অনেকখানি দরিদ্রের উপর যাইয়াই পড়ে। অবশ্য কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, দেশের অধিকাংশই যখন দরিদ্র তখন দরিদ্রকে বাদ দিলে রাজার কড়ি আসিবে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে; যেমন, দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য শাসকবর্গের কি কোনরূপ দায়িত্ব নাই? যে দেশের অধিকাংশ নর-নারী দুবেলা পেট

ভরিয়া খাইতে পায় না, সেই দেশের সৈন্য পোষণ ও শাসনের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য রাজস্বের বেশীর ভাগ ব্যয় করার সার্থকতা কোন্‌খানে? আমাদের এই অসহায় ও হীন অবস্থা বৈদেশিক শাসনের অনুকূল, এমন কি তাহাদের ঈপ্সিত—শিক্ষিত ভারতবাসীরা যদি এইরূপ সন্দেহ হৃদয়ে পোষণ করিতে সুরু করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বেশী দোষ দেওয়া যায় কি? ইহার পর আমরা যখন একে একে ব্যয়ের দিক আলোচনা করিব, তখনও আমরা যে চিত্র দেখিতে পাইব তাহাতে এই দেশের শাসন-নীতি সম্পর্কে উদার ও উচ্চ মনোভাব পোষণ করা কঠিন হইয়া পড়িবে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়

	১৯২১-২২		মোটআয়ের অংশ (শতকরা)	১৯৩৫-৩৬		মোট আয়ের অংশ (শতকরা)
	কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট		কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট	
পণ্য শুল্ক (কাষ্টম্‌স্)	৩৪,৪১ লক্ষ	×	১৮·৫	৫৪,১১ লক্ষ	×	২৫·৭
আয়-কর	১৮,৭৪ ,,	৩,৪৩ লক্ষ	১১·৯	১৭,০৭ ,,	২ লক্ষ	৮·১
লবণ-শুল্ক	৬,৩৪ ,,	×	৩·৪	৮,৫৩ ,,	৩ ,,	৭·০
অহিফেন	৩,০৭ ,,	×	১·৬	১ ,,	×	·২
ভূমি-রাজস্ব	৩৩ ,,	৩৪,৩৯ ,,	১৮·৭	২৮ ,,	৩১,৯১ লক্ষ	১৫·৩
আবগারী	৫৪ ,,	১৬,৬৫ ,,	৯·২	৩৯ ,,	১৪,৮৭ ,,	৭·২
ষ্ট্যাম্পস্	২৫ ,,	১০,৬৩ ,,	৫·৮	৩৯ ,,	১১,৪৪ ,,	৫·৬
বন-বিভাগ	২০ ,,	৫,৬৪ ,,	৩·১	১৬ ,,	৪,১৫ ,,	২·০

রেজিষ্ট্রেশন	২ ,,	১,১২ ,,	·৬	১ ,,	১,১৭ ,,	·৫
দেশীয় রাজ্যের কর	৮৭ ,,	×	·৪	৭২ ,,	×	·৩
সিডিউল ট্যাক্স	×	×	×	×	৪৬ ,,	·২
রেল-বিভাগ	১৫,২১ ,,	২ ,,	৮·২	৩১,৯৮ ,,	১$\frac{১}{৪}$,,	১৫·২
সেচ-বিভাগ	৬ ,,	৫,৭২ ,,	৩·১	৩০॥ হাজার	৯,৪৪ ,,	৪·৪
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ	৫৬ ,,	×	·৩	৭৯ লক্ষ	×	·৩
সুদ	১,১১ ,,	১,০৮ ,,	১·১	৮৬ ,,	২,০২ ,,	১·৩
দেওয়ানী বিচার বিভাগ	৭৭ ,,	২,৭৩ ,,	১·৯	১,০০ ,,	৫,৬৬ ,,	৩·১
মুদ্রা ও টাকশাল	৪,৩৭ ,,	×	২·৩	১,১৭ ,,	×	·৫
সিভিল ওয়ার্কস্	১১ ,,	৬২ ,,	·৩	৩০ ,,	১,৫৫ ,,	·৮
বিবিধ	৭,১৮ ,,	১,৩৮ ,,	৪·৬	৬৪ ,,	১,৯৪ ,,	১·২
সৈন্য বিভাগ	৮,০৭ ,,	×	৪·৩	৫,২১ ,,	×	২·৪
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের চাঁদা	+১২,৯৯ ,,	—১২,৯৯ ,,	×	=৩,০৬ ,,	৩,০৬ ,,	×
অপ্রত্যাশিত।	×	×	×	২। হাজার	১,২৭ ,,	·৬
মোট আয়	১,১৫,২১ লক্ষ	৭০, ৪৩ লক্ষ		১,২১,০৭ লক্ষ	৮৯,০২ লক্ষ	

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়

	১৯২১-২২		মোট ব্যয়ের অংশ (শতকরা)	১৯৩৫-৩৬		মোট ব্যয়ের অংশ (শতকরা)
	কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট		কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট	
রাজস্ব আদায়ের সরঞ্জামী খরচ	৫,২৭ লক্ষ	১১,৬৯ লক্ষ	৭·৬	৪,২২ লক্ষ	৮,৫৩ লক্ষ	৬·৭
লবণ ও অন্যবিধ কেপিট্যাল খরচ	×	×	×	৬/৯০ ”	৮ ”	·৬৩
রেলওয়ে রেভিনিউ একাউণ্ট	২২,৩০ ”	৩ ”	১০·৯	৩১,৯৮ ”	৫০ হাজার	১৫·২
রেলওয়ে কেপিট্যাল একাউণ্ট	×	৩৭ ”	·১	×	×	×
সেচ-বিভাগ প্রভৃতির রেভিনিউ একাউণ্ট	·৪ ”	৪,০৭ ”	১·৮	৫ ”	৬,৬৯ লক্ষ	৩·২
সেচ-বিভাগের কেপিট্যাল একাউণ্ট	৭/১০ ”	১,১২ ”	·৫	৩½ হাজার	৫ ”	·০২
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ রেভিনিউ একাউণ্ট	৫৭ ”	×	·২	৭৯ লক্ষ	×	·৩
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ কেপিট্যাল একাউণ্ট	১,০৯ ”	×	·৪	৬৭ হাজার	×	·০০৩

সাধারণ ঋণের সুদ	৩০,০০ ,,	৯৭ ,,	১৩.৯	৩৮,০৪ লক্ষ	৮,৭৬ ,,	২২.৫
বাদ সুদ বাবদ রেলওয়ে	১৫,৬৩ ,,	৩ ,,	×	৩০,১৮ ,,	৫০ হাজার	×
,, ,, ,, সেচ-বিভাগ	১২ ,,	২,৬০ ,,	×	৩ ,,	৬,০০ লক্ষ	×
,, ,, ,, পোষ্ট ও টেলি-গ্রাফ	৫৭ ,,	×	×	৮১ ,,	×	×
,, ,, ,, লবণ-বিভাগ	×	×	×	৪ ,,	×	×
,, ,, ,, প্রাদেশিক ঋণ-তহবিল	×	×	×	৭,৯৩ ,,	×	×
,, ,, ,, বন বিভাগ	×	৯½ হাজার	×	৭২ হাজার	১৪ ,,	×
,, ,, ,, শিল্প-বিভাগ	×	×	×	×	×	×
অবশিষ্ট দেয় (সাধারণ ঋণ বাবদ)	১১,০৯ ,,	৯৩ লক্ষ	×	—৯৬ লক্ষ	২,২২ ,,	×
অন্যান্য বাবদ সুদ	২,৬০ ,,	×	১.১	১১,৪৬ ,,	৩ ,,	৫.৫
ঋণ পরিশোধ	২,৩০ ,,	৯ ,,	১.১	৩,০০ ,,	১,৩৩ ,,	২.৮
সাধারণ শাসন-বিভাগ	১,৯৩ ,,	৮,৪১ ,,	৪.৬	১,৭০ ,,	১০,৩৬ ,,	৫.৭

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়।

	১৯২১-২২		মোট ব্যয়ের অংশ (শতকরা)	১৯৩৫-৩৬		মোট ব্যয়ের অংশ (শতকরা)
	কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট		কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট	প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট	
অডিট বা আয়-ব্যয় পরীক্ষা-বিভাগ	৭০ লক্ষ	×	·৩	১,০৮ লক্ষ	×	·৫
বিচার-বিভাগ	১০ "	৫,০০ লক্ষ	২·২	৮ "	৫,২৪ লক্ষ	২·৫
জেল ও দ্বীপান্তর ব্যয়	৪৫ "	২,২৫ "	১·০	২৩ "	২,২৪ লক্ষ	১·১
পুলিস	৮৮ "	১১,৯৬ "	৫·৭	৫৩ "	১২,০৯ "	৬·০
বন্দর ও তৎসংক্রান্ত	২৪ "	২৮ "	·২	২৪ "	৮ "	·০১
যাজকীয় বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়	৩১ "	×	·১	৩০ "	×	·১
রাজনৈতিক	২,২৬ "	×	১·০	১,৫৬ "	×	·৭
বৈজ্ঞানিক-বিভাগ	১,১২ "	৭ "	·৫	৬৯ "	৩ "	·৩

শিক্ষা বিভাগ	৩১ „	৬৯ „	৪·০	৩০ „	১১,৯৬ „	৫·৮
চিকিৎসা „	৩১ „	২,৮৫ „	১·৪	২৪ „	৩,৬১ „	১·৮
স্বাস্থ্য „	১৬ „	১,৪১ „	·৭	১৬ „	১,৫২ „	·৮
কৃষি „	২১ „	১,৭৭ „	·৮	৪৪ „	২,৩৩ „	১·৩
শিল্প „	১ „	৬৪ „	·২	৭ „	৮৮ „	·৪
উড়ো „	৮/১০ „	×	·০০৩	১৭ „	৩½ হাজার	·০৮
বিবিধ „	৪১ „	২০ „	·২	২০ „	৭৫ লক্ষ	·৪
মুদ্রা ও টাকশাল	১,০৭ „	×	·৪	৪২ „	×	·২
সিভিল ওয়ার্কস	১,৫৪ „	১০,৪১ „	৫·৩	২,২৫ „	৮,০১ „	৪·৮
বিবিধ	৫,৫৯ „	৬,৯৩ „	৫·৮	৪,৪৮ „	৭,২৫ „	৫·৫
সমর-বিভাগ	৭৭,৮৮ „	×	৩৫·০	৫০,১৯ „	×	২৩·৯
বিশেষ ব্যয়—	×	×	×	২,৭৩ „	৯৯ হাজার	১·৩
	১,৪২,৮৭ লক্ষ	৭৯,১৬ লক্ষ	×	১,২১,০৭ লক্ষ	৮৮,৬৯ লক্ষ	×

১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দ

খরচের জায়	বৃটিশ ভারতে জনপ্রতি সরকারী খরচ
সমর-বিভাগ	৶৭
পুলিশ, জেল, বিচার-বিভাগ	।৶১১
শিক্ষা-বিভাগ	।৶০
চিকিৎসা „	৵৩
স্বাস্থ্য „	৲১১
কৃষি „	৴৭
শিল্প „	৲৬
বৈজ্ঞানিক-বিভাগ	৲৫

আর একটি খরচের হিসাব

(প্রতি হাজার লোকের জন্য)

বৎসর	শাসন সংক্রান্ত ব্যয়	জাতি গঠন মূলক ব্যয়	কর-ভার
১৮৭৬	১৮১০৲ টাকা	১৫৯৲ টাকা	১৯৭৪৲ টাকা
১৮৮৬	২১০৮৲	১৬৬৲	২০৭৩৲ „
১৮৯৬	[illegible]১৪২৲ „	২০১৲	২২০৫৲ „
১৯০৬	২৪৬২৲ „	২৭৭৲ „	২৫৬২৲ „
১৯২১	৪৫১১৲ „	৫৮৮৲ „	৫১৯৬৲ „
১৯২৯	৪২১০৲ „	৮৭৬৲	৫৪০২৲

-:*:-

ভারতে সরকারী ব্যয়

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গবর্ণমেণ্টের আয় সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে ব্যয়ের দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ১৯২১ সাল হইতে সরকারী ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২৯ সালের পর বিশ্বব্যাপী অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের আয় অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে ১৯৩১ সাল হইতে গবর্ণমেণ্টের এই ব্যয়-প্রবণতা খানিকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৩৫ সালে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হইবামাত্র ব্যয়ের রেখা পুনরায় উর্ধগামী হইতে থাকে।

সৈন্য বিভাগ

ব্যয়ের দিকে সর্বপ্রথমেই এই বিভাগের বিশাল ব্যয়-বহর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, এই বাবদ আমাদের ব্যয় শুধু অত্যধিক নহে, সমগ্র আয়ের শতকরা ২৫ ভাগই ইহার ক্ষুধা মিটাইতে যায়। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কিম্বা ইহাকে নিজ শাসনাধীনে রাখার জন্যই যদি এই অর্থ ব্যয় করা হইত, তাহা হইলেও একটা কথা ছিল; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে যে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ও তদানুসঙ্গিক বিরাট আয়োজন করা হইয়াছে তাহা শুধু ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিবার জন্য নহে, উপরন্তু এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র ইংরেজের স্বার্থ সুরক্ষিত ও তাহার মহিমা সকলের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য। প্রমাণ স্বরূপ ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীনে আসিবার পর ভারতীয় সৈন্যকে বহুবার ভারতের বাহিরে অন্যদেশে যুদ্ধে নিয়োজিত করা হইয়াছে। এই বাবদ যে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই

ভারতবর্ষের উপরে চাপান হইয়াছে। সৈন্য-বিভাগের দ্রুত ব্যয়-বৃদ্ধির পর্য্যালোচনা করিলে এই ব্যয়ের পশ্চাতে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা অপেক্ষাও বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ক্ষাত্র-শক্তির প্রতিষ্ঠাই যে মূল উদ্দেশ্য তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না। উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারীদের স্বীকারোক্তি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৬১ সালে এই বিভাগের ব্যয় ১৬ কোটী টাকা ছিল। তৎপর ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২১ সালে প্রায় ৮৮ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। পূর্বে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ভারতীয় সৈন্যের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কিংবা এক পঞ্চমাংশ ছিল; কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া এক তৃতীয়াংশে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য যে উচ্চপদস্থ ও উচ্চ-বেতনভোগী অফিসারদের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। শুধু তাহাই নহে, বৈদেশিক প্রয়োজনের জন্য যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের খরচও ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অধিক। এই সম্পর্কে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য স্বাধীন দেশে সৈন্য বিভাগের দরুণ যে ব্যয় হইয়া থাকে তাহার ফল তদ্দেশীয় সৈন্য, অফিসার, যুদ্ধ-সরঞ্জাম-প্রস্তুতকারক দেশবাসীরা পাইয়া থাকে—এক কথায় দেশের ধন অনেকটা দেশেই থাকিয়া যায়, পরন্তু দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের ও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি লাভের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সেদিক দিয়াও বিশেষ সুবিধা নাই। দেশীয় সৈন্য সংখ্যা যদিও ইংরেজ সৈন্য অপেক্ষা দ্বিগুণ, তথাপি তাহাদের মাহিনা ও ভাতা অনেক কম হওয়ায় তাহাদের জন্য ব্যয় কম। বলা বাহুল্য, সৈন্য বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে ভারতীয় জনমতের কোনই মূল্য নাই; এই বিষয়ে বড়লাটের অভিমতই চূড়ান্ত। ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত গবর্ণমেণ্ট আইনেও এই ব্যয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র অধিকার ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণকে দেওয়া হয় নাই।

সরকারী ঋণ

এই সরকারী ঋণের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের অসহা অবস্থার বিষয় আরও পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হইবে। এই ঋণের পরিমা বর্তমান সময়ে ১২০৮ কোটী টাকার উর্ধে দাঁড়াইয়াছে। সর্বাপেক্ষা লজ্জ ও কলঙ্কের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব বিস্তার ও সুপ্রতি করিবার জন্য ইংরেজকে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহাও ভারতের ঋণ স্বরূপ আমাদের উপরই চাপিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশ বিজয়ের অভিযান-খরচও আমাদের ঋণ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। সিংহল, সিঙ্গাপুর, কেইপ কলোনি, মিশর, জাভা, বর্মা, আফগানিস্থান, পারস্য, চীন,—এমন কি নেপাল অভিযান, ভারতের নামে টাকা ধার করিয়াই সম্পন্ন হইয়াছে। সহজ কথায় বলিতে গেলে আমাদেরই অর্থে আমাদের ও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বিজিত ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিশাল রাজত্ব ও প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে সুদৃঢ় ইস্পাতের কাঠাম নির্মিত হইয়াছে তাহা সুরক্ষিত রাখিবার জন্যও ভারতবর্ষকে পুনরায় বহু টাকা ধার করিতে হইয়াছে। আরও একটু রহস্য এখানে প্রকাশ না করিলে ঋণের ইতিহাস খানিকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কিছুকাল পর্যন্ত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়-ব্যয় ও রাজ্যশাসনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথকভাবে রাখা হইত না। ইহার ফলে ব্যবসার ক্ষতি রাজ্যলব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা পূরণ করা হইত। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের যে দেনা আমাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা রাজ্যশাসন জনিত কিংবা কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতির দরুণ তাহাও বিবেচনা সাপেক্ষ। ১৮৫৮ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের সহিত ১১ কোটী ২২ লক্ষ পাউণ্ড (১৬৮ কোটী টাকা) ঋণভারও গ্রহণ

করেন। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের দরুণ ঋণের পরিমাণ ৩ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (৫২½ কোটী টাকা)। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমনের দরুণ ঋণের বোঝা ৪ কোটী পাউণ্ড (৬০ কোটী টাকা)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষরূপ বিশাল জমিদারি খরিদের মূল্য বাবদ (কোম্পানীর মূলধন ও লভ্যাংশের দরুণ) ইংলণ্ডকে আমাদের দিতে হয় ৩ কোটী ৭২ লক্ষ পাউণ্ড (৫৫॥ কোটী টাকা)। ইহাও আমাদের ঋণ। এতদ্ভিন্ন ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাত হইতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিবার পরও ভুটান, এবিসিনিয়া, আফগানিস্থান, মিশর ও সীমান্তের যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রায় ৯০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতকে ব্যয় করিতে হয় ৩৬৪ কোটী টাকা। তন্মধ্যে ইংলণ্ডকে এই যুদ্ধের দরুণ নিছক সাহায্য দান করা হয় ১৮৯ কোটী টাকা। এতদ্ব্যতীত আর্থিক ব্যাপারে নানারূপ অব্যবস্থা ও অবিবেচনার দরুণ ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ১৮৮৫ সালের পর হইতে আজ পর্যন্ত মোট ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫০ কোটী টাকা। ইহাও ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হইয়াছে। টাকার বিনিময় হার নির্ধারণে ভারত গবর্ণমেণ্ট আগাগোড়া যে স্বার্থান্ধ ও অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহার পরিণাম ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। বিনিময়ের হার অ-স্থির ও পরিবর্তনশীল হওয়ার দরুণ কেবল মাত্র ভারত-সরকারের যে লোকসান হইয়াছে তাহার পরিমাণই ১২৫ কোটী টাকার কম হইবে না। এতদ্ভিন্ন ১৮৭০-৮০ ও ১৮৯৬-৯৭ সালে ভারতবর্ষে যে মন্বন্তর ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল তাহার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রায় ৪০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এই ত গেল নিষ্ফল ঋণের পরিমাণ যাহা হইতে এক কপর্দকও প্রতিদান পাইবার উপায় নাই।

এক্ষণে আমরা অন্য প্রকার ঋণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। এই সব ঋণ সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে, যেহেতু এই অর্থের বিনিময়ে আমরা কিছু প্রতিদান পাইয়া থাকি। এই শ্রেণীর ঋণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) ষ্টেট রেলওয়ে নির্মাণ বা কোম্পানীর রেলওয়ে খরিদ বাবদ ঋণ; (২) সেচ-খাল ও কূপ খননাদির জন্য ঋণ; (৩) ডাকবিভাগ ও সেই জাতীয় সরকারী ব্যবসা পরিচালনার দরুণ ঋণ; (৪) পোর্ট ট্রাষ্ট, ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলি জনহিতকর কার্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের ঋণ দান; (৫) সামন্ত রাজ্য সমূহকে ঋণ দান। উক্ত পাঁচ দফার মধ্যে রেলওয়ে বাবত ঋণের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। তন্মধ্যে আবার বিলাতী কোম্পানীগুলির নিকট হইতে রেল-লাইন ক্রয় করিবার সময় গবর্ণমেণ্টকে যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাই প্রধান। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ কোম্পানীগুলিকে দিবার জন্য পূর্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত থাকায় রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার সময় বহু অর্থের অপব্যয় হইয়াছিল, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তদুপরি ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন এই রেল লাইনগুলি ক্রয় করেন তখন শেয়ার ও জিনিস পত্রের মূল্য অত্যধিক চড়া থাকায় গবর্ণমেণ্টকে উচ্চ মূল্য দিতে হইয়াছিল।

সেচ বিভাগের জন্য যে টাকা ঋণ করা হইয়াছে, জল-সরবরাহের মূল্য বাবদ উচ্চ হারে কর নির্ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেই টাকার উপর শতকরা ৬৲।৭৲ টাকা লাভ পাইয়া থাকেন। সুতরাং এই [illegible]র দরুণ ঘর হইতে ভারত সরকারকে কিছু দিতে হয় না, যদিও ইহার চাপ অন্যভাবে (জল-কর হিসাবে) দরিদ্র প্রজাসাধারণের উপর যাইয়াই পড়ে। তৃতীয় দফার ঋণের পরিমাণ বেশী নহে এবং এই টাকার সুদ প্রায় ডাক-বিভাগ হইতেই পাওয়া যায়। রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির উন্নতি সাধনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট

বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে যে টাকা ধার দেওয়া হয়, তাহার সুদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নূতন কর ধার্য করিয়া পরিশোধ করা হয়—যে সব হিতকারী কার্যে অর্থ নিয়োজিত হয় তাহার লাভ হইতে সুদ বহন করা সম্ভবপর হয় না। ভারতীয় রাজন্যবর্গকে যে সব টাকা ধার দেওয়া হয় তাহাও অনেক ক্ষেত্রে লাভজনক হয় না। শেষ পর্যন্ত কর ধার্য করিয়াই এই ঋণের দায় বহন করিতে হয়। মোট ঋণের উপর যে সুদ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশ বিদেশে চলিয়া যায়; কারণ সেই সব ঋণ অধিকাংশ ইংলণ্ডে করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, ভারতের বিরাট ঋণের বেশীর ভাগই তাহার নিজ স্বার্থ বা উন্নতির জন্য করা হয় নাই, পরন্তু এই অর্থের দ্বারা নিজের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে এবং অপরের স্বাধীনতা হরণে সহায়তা করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আমাদের সম্মতির অপেক্ষা করিতে হয় নাই। সেই জন্যই সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ব্যয়ভার ও ভারত সাম্রাজ্য ক্রয়কালীন খোস মেজাজে দক্ষিণাদানের ব্যাপারটা আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। এই নীতিকে "জোর যার আইন তার" নীতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যকে ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশে যাইয়া লড়িতে হইয়াছিল। ইহা নিশ্চয়ই ভারতের স্বার্থে তাহারা করে নাই। সেই যুদ্ধে যে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর প্রাণ বিসর্জিত এবং দরিদ্র ভারতের কোটী কোটী অর্থ ব্যয়িত হইয়াছি[illegible] তাহার ফলভোগী প্রধানতঃ হইয়াছিলেন ইংরেজ ও তাহার মিত্রশক্তি সমূহ। বিনিময়-হার নির্ধারণ ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণের ফলে ভারতের বহু কোটী টাকা লোকসান ঘটিয়াছে তাহার মূলেও ছিল ভারতে বিলাতী পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি ও দেশীয় শিল্পের প্রতিকূলতা সাধন। কঠোর শুনাইলেও সত্যের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে,

ভারতের রাজস্ব নীতি একদিকে তাহার অর্থোপায়ের সহজ ও স্বাভাবিক উৎসগুলির মুখ শুষ্ক করিয়া দিয়া আর্থিক উন্নতির পথে বাধা দান করিয়াছে, অন্য দিকে শাসন ও সৈন্য বিভাগের দুঃসহ ব্যয়ভার তাহার কুব্জপৃষ্ঠে চাপাইয়া দিয়া তাহার ন্যুব্জ দেহকে আরও পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে।

সত্য বটে অধুনা সমর-বিভাগের ব্যয় চারিদিকে যুদ্ধভীতির দরুণ সর্ব দেশেই অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমর-ঋণের পরিমাণও পর্বত-প্রমাণ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ সমূহ আস্ফালন করে, লড়াই করে, রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য, সৌরমণ্ডলে নিজের একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইবার জন্য। আর আমরা লড়াই করি, অর্থ ব্যয় করি, নিজেরই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমাদের বন্ধনকারীর ঐশ্বর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য। আমাদের দেশের সমর-ঋণের সহিত অন্যান্য দেশের সমর-ঋণের এইখানেই পার্থক্য।

শাসন বিভাগ

এই বিভাগের অমিতব্যয়িতা সকল বিভাগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সমর-বিভাগের ব্যয়বাহুল্যের জন্য এইরূপ একটা যুক্তি অন্ততঃ উপস্থিত করা যাইতে পারে যে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার একটা প্রয়োজন আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ অজুহাতের অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। উচ্চতম রাজকর্মচারী হইতে অধস্তন প্যায়াদা পর্যন্ত সকলেই কাগজপত্রে আমাদের "একান্ত অনুগত ভৃত্য" কিন্তু কার্যতঃ জনসাধারণের কল্যাণ ও সেবার জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব কিংবা তাহাদের মহিমাকীর্তন ও রাজকীয় ঠাট বজায় রাখিবার জন্য জনসাধারণের অস্তিত্ব তাহা বলা কঠিন। মোট রাজস্বের শতকরা ৪০ ভাগই রাজ-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও শাসনের ঠাট বজায় রাখিতে যদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে শাসন এবং শোসন চলিলেও, পালন এবং পোষণ করিবার

অর্থ আসিবে কোথা হইতে? কারণ ইহার উপর সমর বিভাগ, সরকারী ঋণ এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ বিভাগের ব্যয়ও ত বড় কম নহে। শ্বেতহস্তী পোষা বলিয়া বাঙ্‌লায় একটা চলতি কথা আছে। ভারতে ইংরেজ শাসনের ব্যয়-বহর দেখিয়াই এই প্রবাদ বাক্যটির সম্ভবতঃ উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ভারতের আর্থিক অবস্থার সহিত এইরূপ ব্যয়-বাহুল্যের তুলনা করিলে তাহার অসহায় অবস্থার কথাই ভাল করিয়া মনকে আঘাত করে। ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম—অথচ ইহার শাসন-ব্যয় পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অধিক। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক ৬০০৲ টাকার কিঞ্চিৎ অধিক। আমাদের দেশে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, পুলিশ সাহেব এবং তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম—একজন সিনিয়র মুনসেফ্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা অধ্যাপকও তাঁহার অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। অথচ এই জাপান পৃথিবীর উন্নত, শক্তিশালী ও সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের অন্যতম এবং ইহার প্রধান মন্ত্রী যে কয়জন রাষ্ট্রপতি পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের একজন। জাপানের অন্যান্য মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ৪০০৲ টাকাও নহে! কোরিয়ার গবর্ণর-জেনারেল বেতন পান ৪৪০৲ টাকা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ; মাথা পিছু তাহার আয়ও ভারতবাসী অপেক্ষা অনূ্যন ২২ গুণ অধিক। তাহার মন্ত্রীরা বেতন পান ৩,৪১২৲ টাকা। আমাদের দেশে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগুণ বেতন পান ৬,৬৬৭৲ টাকা। গ্রেট বৃটেনের মাথা পিছু আয় আমাদের ১৪ গুণ; তাহার মন্ত্রীরা পান ৫,৫৫০৲ টাকা। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মধ্যে যাহারা একটু সিনিয়র এবং জেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের বেতন ১,০০০৲ টাকা হইতে ৩,৫০০৲ টাকা। বিভাগীয় কমিশনারদের মাহিনা ৩,০০০৲ টাকা হইতে ৪,০০০৲ টাকা। তদুপরি নানারূপ ভাতার ছড়াছড়ি

ত রহিয়াছেই। অথচ বিলাতের সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের মাহিন ১,০০০৲ টাকার অনধিক। কেনাডার মাথাপিছু আয় ভারতের ১৭ গুণ দক্ষিণ আফ্রিকার আয় আমাদের আয় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। তথাপি কেনাডার প্রধান মন্ত্রী পান ৩,৩৭৫৲ টাকা ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ পান ২,২৫০৲ টাকা। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর বেতন ২,৭৭৭৲ টাকা। কিন্তু ভারতের বড়লাটের বেতন ২০,০০০৲ টাকা এবং প্রাদেশিক লাটগণের মধ্যে পাঁচ জনের প্রত্যেকের ১০,০০০৲ টাকা। বলা বাহুল্য, এই সব উচ্চ বেতন-ভোগীদের প্রায় সকলেই ইংরেজ। উচ্চপদস্থ দেশীয় লোকের সংখ্যা পূর্বে অতি সামান্যই ছিল। বহু আন্দোলনের ফলে উচ্চ-কণ্ঠ শিক্ষিত ভারতীয়দের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সম্প্রতি তাহাদের সংখ্যা কিছুটা বাড়ান হইয়াছে। সুতরাং বেতন ও ভাতা বাবদ আমাদের যে অপরিমিত ব্যয় হয় তাহার একটা মোটা অংশই বিদেশে চলিয়া যায়। উচ্চপদের জন্য একদিকে যেমন দান সাগরের ব্যবস্থা, অন্যদিকে কিন্তু অধস্তন কর্মচারীদের বেলায় (যাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই দেশীয়) ফকিরের ভিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণ কর্মনৈপুণ্য, সততা ও আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন তাহার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চাকুরীর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা নীতির অবতারণা করিয়া কর্মচারীদের সততা, সহযোগিতা ও যোগ্যতার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা পূর্ণ করা হইতেছে।

পুলিশ বিভাগ

আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বাহ্যতঃ প্রয়োজন থাকিলেও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। সেই জন্যই নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবাসীর যতই চোখ ফুটিতেছে এবং স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য তাহাদের আন্দোলন বৎসরের পর বৎসর প্রবল হইতেছে, ততই এই বিভাগের ব্যয়-ভার বাড়িয়া চলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা

রক্ষা করিয়া প্রজাগণের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা বিধানই এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে চোর-ডাকাতের হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য তাহাদের যত না ব্যাকুলতা, তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক ব্যস্ততা দেশবাসীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্তশাসন লাভের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করা যদি মানবের জন্মগত অধিকার হয় এবং এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যদি ইংলণ্ড বিগত ও বর্তমান ইউরোপীয় সমরে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের এই আন্দোলন বিধিবহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হওয়া সঙ্গত নহে এবং আমাদেরই অর্থে আমাদিগকে দমন করিবার নীতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। এই বিভাগের ব্যয় ক্রমশঃ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

	১৮৬১-৬২	১৯৩৫-৩৬
পুলিস	২, ১৬, ৩১, ০০০৲ টাকা	১২, ৬১, ৪৫, ২০৮৲ টাকা
আদালত	১, ৯৫, ১২, ০০০৲ „	৫, ৩১, ৯৬, ৭২২৲ „
জেলখানা ও বন্দীশালা	৮৯, ৯৭, ০০০৲ „	২, ৪৭, ০৭, ৪৯২৲ „

সৈন্যবিভাগের সহিত পুলিশ বিভাগের ব্যয় একত্র করিয়া ১৯৩৫-৩৬ সালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭০,৫৯,০৬,৬৭৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। সৈন্যবিভাগ, সরকারী ঋণের সুদ (যাহার অধিকাংশ ভারতের স্বার্থের সহিত সম্পর্কহীন যুদ্ধাদিতে ব্যয় করা হইয়াছে) পুলিশ ও সাধারণ শাসন বিভাগের ব্যয় বাবদ আমাদের মোট রাজস্বের শতকরা ৯৬ ভাগ নিঃশেষিত হইয়া যায়।* কাজেই দেশের সর্বসাধারণের ভাগ্যে ঝিনুক সেচা জল পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া পড়িবে ইহা আর বিচিত্র কি।

*সৈন্য বিভাগের ব্যয় শতকরা ২৪ ভাগ; সরকারী ঋণের সুদ ২২.৫ ভাগ পুলিস ১০ ভাগ, শাসন বিভাগ ৪০ ভাগ = মোট ৯৬.৫ ভাগ।

ভারতে সরকারী ব্যয় (২)

আমরা সমর-বিভাগ, সরকারী ঋণ, পুলিশ ও শাসন বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়াছি—এবং দেখিয়াছি যে মোট রাজস্বের শতকরা ৯৬ ভাগই এই সবে নিঃশেষিত হইয়া যায়—এবং ফলে জাতিগঠন-মূলক কার্যের জন্য আর অর্থের সংস্থান হয় না। ইহা যে কত দূর সত্য তাহাই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে প্রমাণ করিব।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য ব্যয়

কোন জাতির উন্নতি সাধনের জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রয়োজন তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। অর্থাভাব ও উদাসীনতার দরুণ এই অতি-প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও কোনরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ পর্যন্তও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত—কোম্পানীর হাতে যত দিন শাসনভার ছিল তত দিন—শিক্ষার সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা ব্যবস্থা কোন কিছুই ছিল না। শিক্ষার জন্য আলাদা ভাবে অর্থের বরাদ্দও করা হইত না। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর স্থানীয় কর নির্ধারণ দ্বারা কোন কোন প্রদেশে শিক্ষাদানের সামান্য ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু এই ব্যয়ের পরিমাণ অতি নগণ্য ছিল। ১৮৬৭ সালে সারা ভারতবর্ষে এই বাবদে ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৮৬ লক্ষ টাকা। ১৮৮২ সালে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভার মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ড সমূহের উপর অর্পণ করা হয় এবং তাহাদিগকে সেই সঙ্গে শিক্ষাকর ধার্য করিবার অধিকারও প্রদত্ত হয়। কিন্তু তাহাদের আয় ও আর্থিক সচ্ছলতা এতই স্বল্প ছিল যে তাহার দ্বারা সুশিক্ষা কিংবা শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার আশা করা দুরাশা মাত্র ছিল। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি

নগণ্য ছিল এবং এখনও নগণ্য বলা যাইতে পারে। মহামান্য গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও সে চেষ্টা ফলবতী হইতে অনেক দেরী আছে বলিয়াই মনে হয়। বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তিনি তাহার একটি হিসাব (১৯১১ সালে) সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাথা পিছু ব্যয় করেন বার্ষিক ১৬ শিলিং। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ ১০ শিলিং; অষ্ট্রেলিয়া ১১ শিলিং ৩ পেনি; জার্মানী ৬ শিলিং ১০ পেনি; ভারতবর্ষ ১ পেনিও নহে। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটী ও লোক্যাল্‌ বোর্ড সকলে মিলিয়া সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিল ১৫ কোটী, ৭০॥ লক্ষ টাকা। তাহাতে মাথাপিছু শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ॥০ আনা আন্দাজ দাঁড়ায়। এই বৎসরের অন্যান্য দেশের হিসাব লইলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৲ টাকা; ফ্রান্সে ১০৲ টাকা; যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫৲ টাকা। এই প্রকার ব্যয়-বৈষম্যের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, স্বাধীন ও সভ্য দেশের প্রায় সকল নর-নারীই লিখিতে পড়িতে জানে; কিন্তু ভারতবর্ষে সামান্য লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৯.৫ ভাগ মাত্র। তন্মধ্যে ইংরেজী-জানা পুরুষ শতকরা ২ জন ও স্ত্রীলোক .৩ জন মাত্র। ৪২২৩ বর্গ-মাইলের মধ্যে, ৫০ লক্ষ লোকের জন্য একটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কলেজ; ৩১৫ বর্গমাইল ও ৭৮,৩৬৫ জনের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয়; ১০৩ বর্গমাইল ও ২৫,৫৯০ জনের জন্য একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫ বর্গমাইল ও ১৩৫৫ জনের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভারতবর্ষে বিদ্যমান। ইহাদের শিক্ষাপ্রণালী ও ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের আয়োজন যে কত সামান্য তাহা উল্লিখিত অবস্থা হইতে পরিষ্কার প্রণিধান করিতে পারা যাইবে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগ

এই বিভাগের ব্যয় শিক্ষা বিভাগ অপেক্ষাও কম। ১৯৩৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের একত্রে এই বাবদে ব্যয় হইয়াছিল ৫॥ কোটী টাকার কিঞ্চিৎ অধিক। ভারতের ভয়াবহ মৃত্যুর হারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জাতির বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ যে কত সামান্য তাহা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগ পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশ হইতে প্রায় বিতাড়িত হইয়াছে। যেখানে এ সব রোগ অল্পস্বল্প আছে, সেখানে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। পানামা ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহ ম্যালিয়ার জন্য কুখ্যাত ছিল। সেই সব দেশ আজ ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে। অথচ আমাদের দেশে প্রতি বৎসর শতকরা প্রায় ৪৪ জন একমাত্র ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে এবং প্রায় এক কোটী লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করে। বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ লোক বসন্ত ও কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যান্য জ্বর রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ। স্যার জন মিগাও কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে, এক কোটী ত্রিশ লক্ষ লোক কুৎসিৎ ব্যাধিতে, বিশ লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে, ষাট লক্ষ লোক রাত্র্যান্ধতা ও ষাট লক্ষ লোক পূর্ণ-অন্ধতা রোগে এবং বিশ লক্ষ লোক পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে রিকেট্স্ [illegible]গে ভুগিয়া থাকে। এই সব ব্যাধির অধিকাংশই যথোচিত আহার্য ও প্রতিষেধক ব্যবস্থার অভাব হইতে উদ্ভূত হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ভারতবাসীর অবস্থা আজ কতটা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তাহাদের গড়পরতা আয়ুর পরিমাণ হইতে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে আমাদের আয়ুষ্কালের দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ২৩ বৎসর (গড়পরতা)।

মাত্র। অথচ জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণের পরমায়ু ৪৫ হইতে ৬০ বৎসর! ভারতের শিশু-মৃত্যুর হারও মর্মান্তিক রকমে অত্যধিক—হাজার করা ১৮৭ জন। অন্যান্য দেশে ইহার সংখ্যা হাজার করা ৩০ হইতে ৮৫ পর্যন্ত। সকল বীমা কোম্পানীই ভারতবাসীর জীবন বীমার জন্য একটা অতিরিক্ত ফি আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে বা আমেরিকায় বাস করিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর এই অতিরিক্ত ফি দিতে হয় না! যে দেশের স্বাস্থ্য ও জীবনের অবস্থা এইরূপ সে দেশে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কত অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ কর্তৃপক্ষীয়দের চৈতন্যোদয়ের তেমন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কৈ? ১৯৩৫ সালে বৃটিশ ভারতে গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষিত হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৭০০ অর্থাৎ ১৬৩ বর্গমাইলের ভিতর ও চল্লিশ হাজার নর-নারীর জন্য একটি মাত্র হাসপাতাল কিংবা ডিস্‌পেন্‌সারী। কয়েকটা বড় সহরের হাসপাতালগুলিকে বাদ দিলে অন্যান্য হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সারীর আয়োজন ও ব্যবস্থা যেমন নিকৃষ্ট তেমনি অপ্রচুর।

কৃষিবিভাগ

ভারতবাসীর প্রধান অবলম্বন ও উপজীবিকা কৃষি। ভারতের যাহা কিছু শিল্পসম্পদ ছিল তাহা আধুনিক যন্ত্রদানব ও পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের নিকট উৎসর্গ করিয়া দিয়া আমরা অতি সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্য একান্ত ভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। এবং কৃষি সম্পর্কেও আজ পর্যন্ত আধুনিক উন্নত রীতি-নীতির কোন প্রকার ধার না ধারিয়া আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের হলকর্ষণের মধ্যে বাস করিতেছি। যাহাদিগকে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই, নানা রোগে যাহারা নিত্য জর্জরিত, দারিদ্র্য যাহাদের চিরসাথী, তাহারা গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক উৎসাহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে কৃষি ও

অন্যান্য বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কি আছে? ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কৃষি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগই ছিল না। ১৯০৫ সালের পর কৃষির উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে একটি পৃথক কৃষি-বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষক-কুলের সহিত এই বিভাগের আজ পর্যন্ত বিশেষ পরিচয় ও যোগ সংসাধিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ—উপকার তো পরের কথা। কৃষির উন্নতিমূলক 'গবেষণা'র প্রবর্তন, আদর্শ কৃষি ফার্ম প্রতিষ্ঠা ও গোটা ভারতবর্ষে দুই চারিটী কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সব কাজের জন্য উচ্চ বেতনের রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু বিরাট কৃষকসম্প্রদায়ের প্রকৃত হিতসাধনে কিংবা কৃষি-সমস্যার সমাধানে ইহাদের দান কি পরিমাণ তাহা সূক্ষ্ম গবেষণা-সাপেক্ষ। ১৯৩৬ সালে এই বিভাগের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছিল দুই কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ১.৩ ভাগ মাত্র।

শিল্প বিভাগ

বর্তমান কালে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্প প্রতিযোগিতা কিরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই নিজ নিজ দেশে শিল্পের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কত রকম ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করিতেছে, নানা দেশের সহিত কত প্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক চুক্তি করিতেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কতভাবে সহায়তা করিতেছে, তাহা আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমাদের দেশে অল্প [illegible] হইল গবর্ণমেণ্ট একটি বাণিজ্য-বিভাগ খুলিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার কাজের মধ্যে—ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা, শিল্প ক্ষেত্রে চাহিদা মাফিক কিছু উপদেশ দেওয়া এবং কয়েকটি কুটীর শিল্পের উন্নতি-বিধান সম্পর্কে আধুনিক রীতি-নীতির কথা প্রচার করা। যেখানে এক একটা সুপারম্যান বা ডিক্টেটর অমিতবিক্রমে প্রবল ঝড়ের বেগে সমস্ত দেশকে প্রকম্পিত

করিয়া একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়া দেশের শিল্প ও সর্ববিধ উন্নতির জন্য কাজে মাতিয়াছে, সেখানে একটা বিরাট ও প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সমাসীন মৃতকল্প জাতির শিল্পোন্নতি-চেষ্টার নামে যাহা করা হইতেছে তাহা না করিলেও দেশের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইত বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৬ সালে সরকারী শিল্প-বিভাগের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা মোট ব্যয়ের শতকরা '৪ ভাগ মাত্র।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার

ইংরেজ শাসন আমলে আমরা সভ্যতার আলো প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা তাঁহারাও প্রচার করেন এবং আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও আলোক প্রাপ্তির সাথে সাথে অন্যান্য সুসভ্য ও আলোক-প্রাপ্ত দেশের ন্যায় অকাল মৃত্যু ও মহামারীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে অধিকতর সুখের বিষয় হইত না কি? অবনতি ও নিঃস্বতার এমন [illegible] অবস্থান যে সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগেও দেশের [illegible] লোক [illegible] ও অর্ধাহারে তাহাদের হেয় মানবলীলা সম্বরণ [illegible] ৮৭৭ সাল পর্যন্ত এই সব মহামারী ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য [illegible] তহবিল ছিল না, সুচিন্তিত কোন নীতিও [illegible] সাধারণ [illegible] প্রয়োজনমত অর্থ-ব্যয় করা হইত। [illegible] বিল [illegible] থাকার অভাবে দুর্দিন যখন উপস্থিত হইত, তখন সাধারণ [illegible] হইতে [illegible] প্রতিরোধ বা প্রতিকার সামান্যই [illegible] তাই ১৮[illegible] সালের [illegible] হইতে প্রতি বৎসর দেড় কোটী টাকা এই বাবদ পৃথক করিয়া [illegible] হইতেছে। অবশ্য এই তহবিলের টাকা পরবর্তীকালে অনেক সময়ে রেলওয়ে নির্মাণ, সেচ খাল খনন ও পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কার আমলে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত

দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য যে প্রদেশে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও এক-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হইয়াছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার দেড় কোটী টাকার তহবিল হইতে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একটা অংশ দান করিতেন। ১৯১৯ সালের পর প্রত্যেক প্রদেশ নিজেদের জন্য এই বাবদ আলাদা তহবিলের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন এবং ইহার নাম হয় "ফ্যামিন ইন্সিওরেন্স ফণ্ড।"

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা আমাদের দেশে অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা আদৌ প্রয়োজনের অনুরূপ নহে। প্রথমতঃ ১৮৭৭ সালের পর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকের সাহায্যের জন্য সর্বপ্রথম দেড় কোটী টাকার একটি স্বতন্ত্র তহবিলের সৃষ্টি হয়। ইহা ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র, দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত বিরাট দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে; তদুপরি এই তহবিলের টাকা অন্যান্য বাবদেও ব্যয় করা হইয়া থাকে। তারপর কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইলে কর্তৃপক্ষ ইহা সহজে [illegible] তে চাহেন না। পরিশেষে অবস্থা প্রকৃতই অত্যন্ত গুরুতর হই[illegible] দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া সাহায্য দানে অগ্রসর হন, তখন [illegible] প্রয়োজনের তুলনায় সাধারণতঃ [illegible]ম হইয়া থ[illegible] কথা, মানুষ যখন অনাহারে নিতান্ত [illegible]পায় হইয়া মৃত্যুর স[illegible] ও যতটা ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাহায্যের [illegible]জন তা[illegible]ওয়া যায় না। এদিককার কয়েক বৎসরের বি[illegible] দেখা যায় যে ঠিক দু[illegible]র সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ২০।২৫ লক্ষ টাকার অধিক খরচ করেন নাই।

পরিশেষে

ইহাই আমরা উল্লেখ করিতে চাই যে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের নিকট হইতে নানা উপায়ে যে অর্থ বা রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন তাহার

অধিকাংশই ঋণের সুদ দিতে, সমর-বিভাগ, শাসন-বিভাগ, পুলিশ ও জেল-বিভাগের ব্যয় বহন করিতে শেষ হইয়া যায়। মানুষের মত বাঁচিবার জন্য জাতিকে তৈরী করিবার যে বিপুল ও বিস্ময়কর আয়োজন দেশে দেশে চলিয়াছে তাহার কোন কিছু করা এখানে সম্ভবপর হয় না। আধুনিক সুসভ্য দেশগুলিতে দরিদ্র, বেকার, বৃদ্ধ, পীড়িত—প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য গবর্ণমেণ্ট কত চিন্তা করিতেছেন, কত রকম সুব্যবস্থা করিতেছেন। Unemployment relief, poor law relief, old age pensions, sickness insurance প্রভৃতি তাহারই দৃষ্টান্ত। দেশের কোন মানুষ কোন অবস্থায় যাহাতে একেবারে অসহায় হইয়া না পড়ে সে জন্য তাহাদের ভাবনার অন্ত নাই, নব নব পরিকল্পনা ও আয়োজনের অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশের অসহায়দের শেষ আশ্রয়, অগতির গতি—ভগবান ও